প্রকাশনার ৮৩ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩৫ ❖ ১ - ৭ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

অক্টোবর মাস: জপমালা রাণীর মাস

ক্ষুদ্রপুষ্পের ক্ষুদ্র পথ অনুকরণীয় আদর্শ

ঈশ্বরের সৃষ্টি প্রকৃতির পরম বন্ধু আসিসি'র সাধু ফ্রান্সিস

শিক্ষকের প্রতি মর্যাদা ও ভালোবাসা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব **'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।** গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যা বিজ্ঞাপন হার: -

শেষ কভার (চার রঙ)	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো বুক্ড	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো বুক্ড	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো	৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো	২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো	১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো	১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো	৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য।

বিজ্ঞাপন বিভাগ, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৩, সংখ্যা : ৩৫
১ - ৭ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
১৬ - ২২ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
সজল মেলকম বালা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

সৃষ্টির যত্ন বিষয়ক শিক্ষাদানে সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল পালিত হোক সর্বস্থানে

পোপ ফ্রান্সিসের সার্বজনীন পত্র 'লাউদাতো সি' প্রভু তোমার প্রশংসা হোক : আমাদের অভিন্ন বসতবাটী ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ পেলে তা বেশ আলোড়ন তুলে। মানুষ প্রকৃতি ধ্বংস করে পরিবেশের যে বিপর্যয় ঘটাচ্ছে সে সম্বন্ধে সম্যক ধারণা দিয়ে প্রকৃতির প্রতি যত্নশীল হবার বিশেষ আহ্বান খুঁজে পাওয়া যায় পত্রটিতে। পোপ ফ্রান্সিস ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর সময়সীমাতে সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল পালনের আহ্বান রাখলে কাথলিক মণ্ডলী তাতে দারুণভাবে সাড়া দেয়। তবে সৃষ্টির যত্ন নেবার ব্যাপারে প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন প্যাট্রিয়ার্ক প্রথম দিমিট্রিওস ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে। ঐ সময়ে তিনি সকল খ্রিস্টমণ্ডলীকে একত্রে অভিন্ন বসতবাটী পৃথিবীর যত্ন এবং সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা ও বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণের জন্য একটি মাস পালনের প্রস্তাব দেন। সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল পালনে পালে হাওয়া লাগে পোপ ফ্রান্সিসের সার্বজনীন পত্র 'লাউদাতো সি' বা তোমার প্রশংসা হোক পত্রটির প্রকাশের পঞ্চবার্ষিকীতে অর্থাৎ ২০২০ খ্রিস্টাব্দে। তখন থেকে কাথলিক মণ্ডলী সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল পালনে সক্রিয় হয়ে উঠে এবং তাতে ব্যাপকতা ও গতিশীলতা আসে।

সৃষ্টি উদ্‌যাপন কালের লক্ষ্য হতে পারে; প্রথমত: সৃষ্টির উত্তমতা ও সৌন্দর্য দেখে সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা করা এবং দ্বিতীয়ত: সৃষ্টি-প্রকৃতির যথার্থ ব্যবহার ও যত্নদানের মাধ্যমে সৃষ্টির উত্তমতা রাখতে সহযোগী হওয়া। বাইবেলে বর্ণিত সৃষ্টি কাহিনীতে আছে- সৃষ্টিকর্তা মানুষসহ প্রকৃতির সমস্ত কিছুকেই উত্তম রূপে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিকর্তার সমগ্র উত্তম সৃষ্টিকর্মের একটি অংশ মানুষ এবং এই মানুষের উপরই সৃষ্টির উত্তমতা রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছেন। ঈশ্বর সুনিশ্চিতভাবেই তাঁর সৃষ্ট প্রকৃতির যত্ন নিতে সক্ষম, কিন্তু তিনি একাজে নিয়োগ দেন মানুষকে। ঈশ্বরের সৃষ্ট অপূর্ব সুন্দর পৃথিবীর যত্ন দান করার জন্য মানুষের উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়। প্রকৃতিকে রক্ষা করা, যত্ন করা ও ফলশালী করার দায়িত্ব মানুষের উপর। মণ্ডলীর ইতিহাসে আসিসির সাধু ফ্রান্সিস ও ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা প্রকৃতির সৌন্দর্য ধ্যানে ও প্রকৃতির সাথে মিতালি গড়ে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করেছেন। সৃষ্টি উদ্‌যাপন কালের সময় সীমায় অর্থাৎ ১ অক্টোবর ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা ও ৪ অক্টোবর আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের পর্ব পালন খ্রিস্টানদেরকে সৃষ্টির সৌন্দর্য ধ্যানে ঐশ প্রশংসা করার সাথে সাথে সৃষ্টির যত্নশীলতায় প্রবেশ করতে আরেকটু বেশি মনোযোগী করবে বলে মনে করি।

প্রকৃত শিক্ষা একজন ব্যক্তিকে প্রকৃতি ও মানুষের প্রতি যত্নশীল হতে সাহায্য করে। আর বেশিরভাগ শিক্ষকই চান শিক্ষার্থীরা মানবতাবোধে, নৈতিকতায় ও প্রকৃতি প্রেমে বেড়ে ওঠুক। কিন্তু তা অনেকক্ষেত্রেই বাস্তবায়িত হচ্ছে না। কেননা অনেক শিক্ষিত ও বয়স্ক মানুষ নিজেদের স্বার্থপরতা ও ভোগ-বিলাসিতা চরিতার্থ করতে গিয়ে প্রকৃতিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, ঝড়-জ্বলোচ্ছাস, বজ্রপাত, বরফগলা, মরুকরণ ইত্যাদির সাথে শব্দদূষণ, বায়ুদূষণ, নদীদূষণ প্রভৃতি নেতিবাচক প্রভাব তীব্রতর হচ্ছে। আর এগুলোর নেপথ্যে রয়েছে নৈতিকতা ও মানবিকতার দূষণ। এ দূষণ দূর করতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে পারেন শিক্ষকেরা। তবে এ শিক্ষকগণ শুধুমাত্র স্কুল-কলেজের শিক্ষক নন। পরিবার, প্রতিষ্ঠান, প্রতিবেশি-পড়শী উপযুক্ত সকল ব্যক্তিই তাদের উত্তম জীবনাদর্শ ও কাজ দ্বারা অন্যদের শিক্ষক হয়ে ওঠতে পারেন। বর্তমান দূষণময় পরিবেশকে সুষম ও সুস্থ পরিবেশে আনয়ন করতে ছোট-বড় সকলকেই সিনোডাল বোধ নিয়ে কাজ করতে হবে। আর ছোট ছোট কাজ বাস্তবায়িত করার মাধ্যমেই অর্থাৎ নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলে, যেখানে সেখানে থুতু/ময়লা না ফেলে, বৃক্ষ রোপণ, প্লাষ্টিকজাত দ্রব্য ব্যবহার হ্রাস, খোলাজায়গা, ছাদে, ব্যালকনিতে সবজি চাষ করে প্রকৃতিজাত খাদ্য যোগানের ব্যবস্থা করেও আমরা প্রকৃতির যত্ন দান করতে পারি। মানুষের মঙ্গলের জন্যই সৃষ্টি-প্রকৃতিকে যথার্থ যত্ন নিতে হবে। সভা-সেমিনার, কর্মশালার মধ্যদিয়ে সচেতনতা আনয়ন যেমনি দরকার তার থেকেও বেশি দরকার আপন আপন ঘর,পরিবার, সমাজ, ধর্মপল্লী বা ধর্মপ্রদেশে সৃষ্টির যত্নে বাস্তবমুখী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন। †

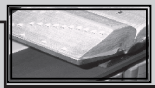

যিশু তাদের বললেন, আমি আপনাদের সত্যি বলছি, কর আদায়কারীরা ও বেশ্যারা আপনাদের আগে আগেই ঈশ্বরের রাজ্যের দিকে চলেছে। -*মথি ২১: ৩১*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

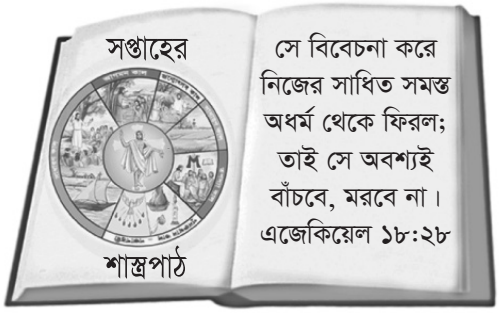

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১ - ৭ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

১ অক্টোবর, রবিবার
এজেকিয়েল ১৮: ২৫-২৮, সাম ২৫: ৪-৯, ফিলি ২: ১-১১ (সংক্ষিপ্ত ১-৫), মথি ১: ২৮-৩২

২ অক্টোবর, সোমবার
পুণ্য রক্ষীদূতগণ, *স্মরণ দিবস*
যাত্রা ২৩: ২০-২৩, সাম ৯১: ১-৬, ১০-১১, মথি ১৮: ১-৫, ১০

৩ অক্টোবর, মঙ্গলবার
জাখা ৮: ২০-২৩, সাম ৮৭: ১খ-৭, লুক ৯: ৫১-৫৬

৪ অক্টোবর, বুধবার
আসিসির সাধু ফ্রান্সিস, *স্মরণ দিবস*
নেহে ২: ১-৮, সাম ১৩৭: ১-৬, লুক ৯: ৫৭-৬২

৫ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার
সাধ্বী ফাউস্তিনা কভাল্স্কা, চিরকুমারী
নেহে ৮: ১-৪ক, ৫-৬, ৭খ-১২, সাম ১৯: ৮-১১, লুক ১০: ১-১২

৬ অক্টোবর, শুক্রবার
সাধু ব্রুনো, যাজক
বারুক ১: ১৫-২২, সাম ৭৯: ১-৫, ৮-৯, লুক ১০: ১৩-১৬

৭ অক্টোবর, শনিবার
জপমালার রাণী মারীয়া
শিষ্য ১: ১২-১৪, গীতিকা লুক ১: ৪৬-৫৫, লুক ১: ২৬-৩৮
চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের প্রতিপালিকার পর্ব দিবস

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১ অক্টোবর, রবিবার
+ ২০২১ সিস্টার মেরী ফ্রান্সিস্কা এসএমআরএ (ঢাকা)

২ অক্টোবর, সোমবার
+ ১৯৪৫ বিশপ তিমথি জন ক্রাউলী সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৬৯ সিস্টার লরেট ভার্ভিয়ে সিএসসি
+ ২০১৪ ফাদার গ্রেগরিও স্কিয়াভি পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০১৭ সিস্টার জুলিয়েট মার্গারেটা মেন্ডেজ এলইচসি (বরিশাল)

৩ অক্টোবর, মঙ্গলবার
+ ১৯৫৭ ফাদার চেসারে কাত্তানের পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০১৮ সিস্টার মেরিলীন এসএমআরএ (ঢাকা)

৪ অক্টোবর, বুধবার
+ ২০০৯ সিস্টার ডেলফিনা রোজারিও সিআইসি (দিনাজপুর)

৫ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৯৩ সিস্টার মেরী আইরিন এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০০৯ ফাদার জভান্নি আব্বিয়াতি এসএক্স (খুলনা)
+ ২০১৯ সিস্টার মারী টুডু এসসি (রাজশাহী)
+ ১৯৭৭ সিস্টার এম. আইরিন আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৭ ফাদার পৌলিন ডেমার্স সিএসসি
+ ২০২০ ব্রাদার রবি থিওডোর পিউরিফিকেশন সিএসসি (ঢাকা)

৭ অক্টোবর, শনিবার
+ ১৯৩৫ ফাদার পিটার ডি'রোজারিও সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৪ ফাদার লিও স্যুলিভান সিএসসি (ঢাকা)

খ্রীষ্টের একক যাজকত্ব

পাপময়তার পরিবেশে বিবাহ

১৬০৬: প্রতি মানুষই তার চারপাশে ও তার নিজের মধ্যে মন্দতা উপলব্ধি করে। নর ও নারীর সম্পর্কের মধ্যেও এই উপলব্ধি অনুভূত হয়। তাদের মিলন-সম্পর্কে সর্বদাই মতভেদ, কর্তৃত্বের মনোভাব, অবিশ্বস্ততা, হিংসা ও বিরোধ হুমকির সৃষ্টি করে, যার ফলে দেখা যায় ঘৃণা ও বিচ্ছেদ। এই অমিল কমবেশী প্রকটরূপ ধারণ করতে পারে এবং কৃষ্টি, যুগ ও ব্যক্তির পরিস্থিতি অনুসারে কমবেশী জয় করা যেতে পারে। তবে তা সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য বলে মনে হয় না।

১৬০৭: যে অমিল আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করি, তা বিশ্বাসের দৃষ্টিতে নর নারীর প্রকৃতি থেকে কিংবা তাদের সম্পর্কের প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হয় না, বরং তা হয় পাপ থেকে। ঈশ্বরের সঙ্গে বিচ্ছেদে যে প্রথম পাপ হল তার ফলশ্রুতিতে নর নারীর মধ্যে আদি মিলনের ভাঙ্গন ধরল। পারস্পরিক পাল্টা অভিযোগের মাধ্যমে তাদের সম্পর্ক বিকৃত হল। তাদের পারস্পরিক আকর্ষণ, যা সৃষ্টিকর্তার নিজস্ব দান, কর্তৃত্ব ও ভোগলালসায় পরিবর্তিত হল; এবং ফলবান হওয়া, বংশবৃদ্ধি করাও জগৎকে বশীভূত করার জন্য নর-নারীর যে সুন্দর আহ্বান, তা বোঝাস্বরূপ হয়ে উঠল সন্তান প্রসবের তীব্র যন্ত্রনায় ও পরিশ্রমের ক্লেশে।

১৬০৮: তদসত্ত্বেও সৃষ্টির ব্যবস্থা বহমান রয়েছে, যদিও তা গুরুতরভাবে ব্যাহত হল। পাপের এই ক্ষত নিরাময় করতে, নর-নারীর প্রয়োজন এমন কৃপা ও সাহায্য, যা ঈশ্বর তার অসীম করুণায় কখনো দান করতে অস্বীকার করেন না। তাঁর সাহায্য ছাড়া নর ও নারী তাদের জীবনের সেই মিলন অর্জন করতে পারে না, যে-মিলনের জন্য ঈশ্বর তাদের 'আদিতেই' সৃষ্টি করেছিলেন।

১৬০৯: ঈশ্বর তাঁর করুণায় পাপী মানুষকে ভুলে যাননি। পাপের ফলশ্রুতিতে শাস্তি,'সন্তান-প্রসবের যন্ত্রনা' এবং মাথার ঘাম পায়ে ফেলার শ্রমের মধ্যে নিহিত আছে সেই প্রতিকার, যা পাপের ক্ষতিকারক প্রভাব সীমিত করে। মানুষের পতনের পর তার আত্মকেন্দ্রিকতা, অহংবোধ, আত্মসম্ভোগের বাসনা জয় করতে, এবং অন্যের প্রতি উন্মুক্ত হতে এবং পারস্পরিক সহায়তা এবং আত্মদান করতে বিবাহ সাহায্য করে।

১৬১০: প্রাক্তনবিধানের শিক্ষায় বিবাহের একতা ও অবিচ্ছেদ্যতা সম্পর্কিত নৈতিক বিবেক বিকাশ লাভ করেছে। প্রাক্তনসন্ধিতে কুলপতি ও রাজাদের বহু-বিবাহ বাহ্যতঃ অস্বীকৃত হয়নি। তা সত্ত্বেও, মোশীর কাছে প্রদত্ত বিধানের উদ্দেশ্য ছিল স্বামীর স্বেচ্ছাচারী কর্তৃত্বের হাত থেকে স্ত্রীকে রক্ষা করা, যদিও প্রভুর বাণী অনুসারে সেই বিধান মানুষের "অন্তরের কাঠিন্যের" ইঙ্গিত বহন করে,যার কারণে মোশী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার অনুমতি স্বামীকে দিয়েছিলেন।

১৬১১: ইস্রায়েলের সঙ্গে ঈশ্বরের সন্ধিকে বিবাহের একক ও বিশ্বস্ত ভালবাসার নিদর্শন হিসেবে লক্ষ্য করে, প্রবক্তাগণ বিবাহের একতা ও অবিচ্ছেদ্যতার গভীর বোধে বিবেক গঠনে মনোনীত জাতিকে প্রস্তুত করেছেন। রুথ ও তোবিথ গ্রন্থ বিবাহের উন্নতবোধ এবং দম্পতিদের বিশ্বস্ততা ও কোমলতার প্রাণময় সাক্ষ্য বহন করে। ঐতিহ্য অনুসারে, পরমগীত ও মানবীয় ভালবাসার এক অনন্য প্রকাশ, যেন ঈশ্বরের ভালবাসারই পূর্ণ প্রতিফলন-যে ভালবাসা 'মৃত্যুর মতোই বলবান', 'বিপুল জলরাশি যা নিভাতে পারে না'॥

ফাদার ডমিনিক কে হালদার

১ম পাঠ : এজেকিয়েল ১৮: ২৫-২৮
২য় পাঠ : ২: ১-১১ (সংক্ষিপ্ত ১-৫)
মঙ্গলসমাচার : মথি ১: ২৮-৩২

আজকের খ্রিস্টযাগের মঙ্গলসমাচারে সাধু মথি যিশুর একটি উপমা কাহিনী ব্যবহার করেছেন। যা নাকি প্রতীকি উপমা symbolic action বলে বিবেচিত। এই উপমার মধ্যদিয়ে সাধু মথি মানুষের দুটি স্বভাবের কথা বলেছেন। এক হল যারা কথা দিয়ে কথা রাখে না, দুই যারা প্রকৃত বাস্তবতা জানে না, বুঝে না এমনকি বিশ্বাসও করে না বলেই কোন কাজে প্রথমত তারা "না" বলে। কিন্তু যখন বুঝে বা জানে বা শিখে তখন সেটা আগ্রহের সাথে করে। এই দুটি চরিত্রের অনেক মানুষ জেরুসালেমকে ঘিরে ছিল। যিশু নিজেই এর অভিজ্ঞতা করেছেন, বিরক্ত হয়েছেন এমনকি তাদের মন পরিবর্তনে আনন্দও প্রকাশ করেছেন। মঙ্গলসমাচারের পটভূমিতে সাধু মথি যিশুর কাজের সাথে তৎকালীন মানুষদের একটি মিল খুঁজে পেয়েছেন। এক শ্রেণির মানুষ যারা ফরিসী, সাদুকী এমনকি ধর্মীয় যাজককূল তাদের ব্যবহারে যিশু সত্যিই বিরক্ত হতেন। এক্ষেত্রে তিনি তাদের তিরস্কার পর্যন্ত করেছেন। আবার এক শ্রেণির মানুষ যারা করগ্রাহক, গনিকা ঈশ্বরকে যারা জানে না তাদের মন পরিবর্তনে যিশু আনন্দ করেছেন। তাদেরকে আদর্শ করে রেখেছেন। আজকের এই উপমার পটভূমি যেমন জেরুসালেমের মন্দিরে কেনা বেচা, *(মথি ২১:১২-১৩)* একটি মিষ্টি ডুমুর গাছকে ফল না দেবার জন্য অভিশাপ দেয়া *(মথি ২১:১৮-১৯)* লোকেদের সাথে ফরিসীদের কঠিন আচরণে *(মথি ২১:২৩-২৪)* যিশু অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন অথচ এই ফরিসীরা, ধর্মনেতারা যিশুর পথ জানতেন, ঈশ্বরকে মানতেন ও বিশ্বাস করতেন। এই ঘটনাগুলোর পর পরই আজকে যিশুর এই উপমা কাহিনী ফরিসীদের কাছে যিশুর "নৈতিক কটাক্ষ" বলে বিবেচিত। তৎকালীন জেরুসালেমে ঘিরে এ ধরনের লোকদের একটি বাস্তব চিত্র সাধু মথি তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে পাপীর মন পরিবর্তন ছিল ঈশ্বরের আনন্দ। যেমন মথি নিজেও করগ্রাহক থেকেও যিশুর ডাকে সঙ্গে সঙ্গে তার অনুসরণ করেছিলেন। বাইবেলে উল্লেখিত মারীয়া মাগ্দালেনা পাপিষ্ঠা হওয়া সত্বেও যিশুর ভালোবাসায় তার শিষ্যত্ব লাভ করেছিল। যিশুর আনন্দ এখানেই পূর্ণতা লাভ করেছে। মথি ২৬:৬ মঙ্গলসমাচার মানুষের দুটি পথ নির্দেশনার কথা বলে (common class people directives) কাজের চেয়ে পদ নিয়ে যারা ব্যস্ত। ফরিসীরা ও ধর্মীয় নেতারা এবং রাজনৈতিক নেতারাও যারা কথা বেশি বলত কিন্তু কাজ করত না, যাদের ভক্তি বিশ্বাস দেখলে মনে হয় ঈশ্বর ভীতি অনেক অথচ তাদের জীবনে তা অনুশীলন করে না। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে "বাইরে ফিটফাট ভিতরে সদরঘাট" অন্যভাবেও বলা হয় কথ ায় বৃহস্পতি কাজে শূন্য। এ সমস্ত মানুষ বাইরের সৌন্দর্যকে বেশি প্রাধান্য দেয় কিন্তু হিংসা, রাগ, ক্ষমাহীন জীবন তাদের জীবনকে অমানুষ করে তুলেছে। একটা বাস্তব উদাহরণ তুলনীয়। কোন এক সময় আমি ভারতের কোন একটা গির্জায় পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্যে অংশগ্রহণ করি। হঠাৎ আমার চোখে পড়ে একটা স্মার্ট যুবক ছেলে বাহ্যিক ভাবে অত্যন্ত পরিষ্কার তার ব্যবহৃত একটি গেঞ্জি, যাতে লেখা আছে "I hate you" পবিত্র খ্রিস্টযাগের শেষে আমি সেই ছেলেকে ডাকলাম। তাকে কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়ে তাকে সময় দিলাম এমনকি তাকে জিজ্ঞাস করলাম তোমার এই পরিষ্কার গেঞ্জির উপরে "I hate you" কেন ব্যবহার করছ। দীর্ঘ সময় নীরব থাকার পর উত্তর এলো যার মধ্যে প্রকাশ পেলো আক্রোশ, নির্মম শাস্তি, ক্ষমাহীন আচরণ, অশ্রাব্য গালি। সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝলাম ছেলের অন্তর ভাল না বাইরের সৌন্দর্য তাকে ভাল দেখালেও এটি মানবিক পরিচয় নয়। অন্তরের সৌন্দর্যই মানুষের পরিচয়। ছেলেটাকে আরো সময় দিলাম ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি তাকে ব্যক্ত করলাম যে ঈশ্বর তোমাকে ভালোবাসেন। তিনি অসীম সৌন্দর্যের মালিক তোমার হৃদয়ে তার সৌন্দর্যকে নষ্ট করো না। সাধু যাকোবের কথা "তোমাদের মধ্যে কি থেকে জাগে যুদ্ধ, কি থেকেই বা বাঁধে যত বিবাদ? তোমাদের অন্তরে ভোগ সুখের যে বাসনা নিত্য সংগ্রাম করে তা থেকেই কি নয়? তোমরা লোভ করছ কিন্তু হাতে কিছু পাচ্ছ না আর সেজন্যই তোমরা হত্যা করতে যাচ্ছ। তোমরা ঈর্ষা করছো কিন্তু মনের ইচ্ছা মিটাতে পারছ না, আর সে জন্যই বিবাদ বাঁধাচ্ছ, যুদ্ধ করছ। আসলে তোমরা যা পেতে চাও তা পাবার জন্য প্রার্থনা করোনা বলেই তা পাও না। কিংবা প্রার্থনা করেও তোমরা পাচ্ছ না তার কারণ তোমরা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়েই প্রার্থনা করছ। অর্থাৎ তোমরা নিজেদের ভোগ সুখের পিছনেই ব্যয় করতে চাইছ (যাকব ৪:১-৩)। তোমার কষ্ট তোমার মনের অস্থিরতা তুমি গ্রহণ কর ও ক্ষমা করে দাও। এতে ছেলেটি নিজেকে বুঝতে চেষ্টা করলো এবং আমাকে কথা দিল যে সে এখন থেকে তার অন্তরের সমস্ত কলুষিত চিন্তাভাবনা দূর করে মানুষকে ভালোবাসবে নুতনভাবে জীবন যাপন করতে চেষ্টা করবে। তাৎক্ষণিকভাবে আমি তাকে ঈশ্বরের নামে আশীর্বাদ করলাম ও ঈশ্বরের আনন্দ তার সাথে সহভাগিতা করলাম। অন্যদিকে সাধারণ সরল মানুষ যারা আপাতত দৃষ্টিতে অসহায় বলে মনে হয়, যারা জানে না, কম বোঝে, পাপী, দুর্বল যিশুর স্পর্শে, ভালোর স্পর্শ পেয়ে মন পরিবর্তন তারা সুন্দর জীবনের অধিকারী হয়েছে। ঈশ্বর এদের জন্য খুবই আনন্দিত *(সাম ১১৮:১৫)* ধর্মিষ্ঠের শিবিরে শিবিরে, শোন, উল্লাস-ভরা ওই যে জয়ের ধ্বনি। ঈশ্বর এদের প্রতি সুপ্রসন্ন।

আমরা কোনটা নেব? একই ব্যক্তিত্বে কথ ায় ও কাজের সমন্বয় করে নিজের জীবনকে পরিচয় প্রদান করা হল ঈশ্বরের পথে এগিয়ে যাওয়া। ব্যক্তির মধ্যে ঈশ্বর উপস্থিত। তার বাক শক্তি ঈশ্বরের প্রজ্ঞা। ঈশ্বর নিজেই মানুষ হয়েছেন। প্রকৃত মানুষ হয়ে মানুষকে মানবতার জায়গা দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই এসো আমরা আমাদের অন্তরের প্রদীপ জ্বালাই, জীবনের গভীরে যাই ভিতরের দিকে শিকড়ের দিকে, বাইরে যাই প্রসারের দিকে, সবার মাঝে তাহলে ঈশ্বর আমাদের তার অনুগ্রহ দিয়ে পূর্ণতা দান করবেন, আমাদের আশীর্বাদ করবেন। ঈশ্বর আমাদের কাছে এটাই চান। প্রভুর শান্তি আমাদের সবার অন্তরে আসুক॥

ক্ষুদ্রপুষ্পের ক্ষুদ্র পথ অনুকরণীয় আদর্শ

ফাদার তুষার জেভিয়ার কস্তা

অবতরণিকা: "ছোট ছোট বালু কণা বিন্দু বিন্দু জল, গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল"। হঠাৎ করে কেউ বড় হয় না। ছোট থেকে হাঁটি হাঁটি পা পা করে মানুষ বড় হয়। বড়দের কাছে মাথা নত করে আশীর্বাদ নিয়ে মানুষ একসময় বড় হয়। অর্থাৎ ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজা তাঁর সমগ্র জীবন সাধনা দিয়ে আমাদের সামনে আদর্শ রেখে গেছেন ছোট কাজ করেও সাধু বা সাধ্বী হওয়া যায়। মাটির ব্যাংকে প্রতিদিন ১০ টাকা বা ২০ টাকা করে জমা করলে বছর শেষে একটা বড় অংকের টাকা পাওয়া যায়। আর বিপদের সময় সেই টাকা বড় বিপদ থেকে উদ্ধার করে। প্রতিদিন ছোট ছোট ভাল কাজ মৃত্যুর সময় আমাদের নরকের আগুন থেকে রক্ষা করবে। আর এই ভাল কাজগুলোর বিনিময়ে মানুষ একদিন সাধু বা সাধ্বী হতে পারে। কিন্তু ভাল কাজ করতে হবে শতভাগ ভালোবাসা দিয়ে।

ক্ষুদ্র কাজ, বড় ভালোবাসা: যারা মহান হয়েছেন তারা অনেক বড় বড় কাজ করেননি। ছোট কাজ কিন্তু বড় ভালোবাসা নিয়ে করেছেন। ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজা সমন্ধে লেখার এই অংশে মাদার তেরেজার একটি ঘটনা উল্লেখ করতে চাই। মাদার তেরেজা প্লেনে করে কোথাও যাচ্ছিলেন। একজন ভদ্রলোক লক্ষ্য করলেন মাদার কিছুক্ষণ পর পর ওয়াশ রুমে যাচ্ছেন। তিনি ভাবলেন মাদারের মনে হয় কোন সমস্যা হচ্ছে। তাই তিনি মাদারকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি কোন অসুবিধা হচ্ছে? আপনি বার বার ওয়াশ রুমে যাচ্ছেন। তখন মাদার বললেন, না আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না। আমি ওয়াশ রুমে যাচ্ছি কারণ প্রত্যেকজন মানুষ যেন ওয়াশ রুমটি ভালমত ব্যবহার করতে পারে। মহান একজন মানুষ অথচ প্লেনে পাবলিক ওয়াশ রুম পরিষ্কারের কাজ করছেন। যদি মানুষের প্রতি ভালোবাসা না থাকে তাহলে একাজ করা সম্ভব না।

ভালোবাসার বৃষ্টি: ক্ষুদ্রপুষ্প তাঁর বোন সেলিনকে এক পত্রে লিখেছিলেন, "যিশুর মুখমণ্ডলের দিকে চেয়ে দেখো, তখন তুমি বুঝতে পারবে তিনি তোমাকে কত ভালোবাসেন।" আমরা সবাই ভালোবাসা পেতে চাই, অন্যকে ভালোবাসা দিতে চাই। ভালোবাসার বৃষ্টি যখন আমাদের উপর ঝরে পড়ে তখন আমরা অনেক খুশী হই। আমাদের জীবন সজীব, প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ক্ষুদ্রপুষ্প উপলব্ধি করেছিলেন, পৃথিবীতে মানুষের জন্য অনেক ভালোবাসা দরকার। তাই তিনি বলেছিলেন, "আমার মৃত্যুর পর আমি পৃথিবীতে গোলাপ বৃষ্টি বর্ষণ করব।" গোলাপ ফুল ভালোবাসা প্রকাশের ঐশ নিদর্শন। স্বর্গ থেকে বৃষ্টির বদলে গোলাপের পাপড়ি ঝরে পড়ছে। এই ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে পাপী মানুষ তাদের জীবন পরিবর্তন করবে, যিশুর পথ অনুসরণ করবে। ঐশ করুণা যখন গোলাপের পাপড়ির ন্যায় পাপী তাপী সবার উপর ঝরে পড়বে তখন সবাই যিশুর পথ অনুসরণ করতে শুরু করবে।

ঐশরিক গুণে যাপিত জীবন: বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসায় তাঁর সহজ-সরল জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে সারাটি জীবন ঐশরিক গুণের সাধনা করে গেছেন। তিনি নিজের হাতে আঁকা একটি ছবির পেছনে এ কথা লিখেছিলেন, "আমি যা বিশ্বাস করেছিলাম, এখন তা দেখতে পাচ্ছি; আমি যা আশা করেছিলাম, এখন তা উপভোগ করছি এবং আমার প্রেমের সমস্ত শক্তি দিয়ে যাঁকে ভালোবেসেছি, আমি এখন তাঁর সাথে মিলিত হচ্ছি।" যিশুর সাথে যুক্ত থাকলে, বাণী অনুসারে জীবন যাপন করলে এবং ঐশরিক গুণাবলী চর্চা করলে একজন মানুষ এই কথা বলতে পারে। তিনি যিশুকে ভালোবেসে বলতে পেরেছিলেন, "প্রেম করে কষ্টভোগ করার মাঝেই রয়েছে সবচেয়ে খাঁটি আনন্দ"। যাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসা যায়, উপলব্ধি করা, অনুসরণ করা যায় তার জন্য অপরিসীম কষ্টভোগ করা সম্ভব। ঐশরিক গুণের আবেষ্টনে তখন আমরা আবিষ্ট থাকি আর ভাল কাজ করি।

ভালোবাসার জন্য তৃষ্ণার্ত হৃদয়: তেরেজা প্রায়শ ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মূর্তির কাছ থেকে শুনতে পেতেন "আমি তৃষ্ণার্ত"। জগতে এত যুদ্ধ, অশান্তি, অরাজগতা, হিংসা, লোভ লালসা। যিশু মানুষের ভালবাসার জন্য তৃষ্ণার্ত, যিশু মানুষের শান্তির জন্য তৃষ্ণার্ত, যিশু মানুষের ন্যায্যতার জন্য তৃষ্ণার্ত, যিশুর মানুষের ক্ষমার জন্য তৃষ্ণার্ত। ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মূর্তি হাতে নিয়ে তেরেজা বলতেন, "হ্যাঁ, আমি তোমাকে ভালোবাসি! প্রভু আমার, আমি তোমায় ভালোবাসি"। যিশুকে ভালবেসে তিনি ছোট ছোট কাজগুলো হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা দিয়ে করতেন। কনভেন্টে অন্য সিস্টাররা তাঁকে কষ্ট দিতেন, হাসাহাসি করতেন, উপেক্ষা করতেন, ভাল কাজ করতে বাঁধা দিতেন কিন্তু তিনি যিশুকে ভালোবেসে নিঃশব্দে কষ্ট স্বীকার করে সর্বদা ভাল কাজ করে যেতেন। অন্যকে দোষারোপ কিংবা ক্ষতির বদলে ক্ষমা করতেন এমনকি তাদের মনের পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা করতেন, ত্যাগস্বীকার করতেন।

শিশুসুলভ নির্ভরশীলতা: যিশু শিশুদের অনেক ভালোবাসতেন। তিনি বলতেন, শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও, তাদের বাঁধা দিও না। ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজার ঈশ্বরের প্রতি এক শিশুসুলভ নির্ভরশীলতা ছিলো। পোপ পঞ্চদশ বেনেডিক্ট তাঁর এই জীবন পথকে "ঈশ্বরের প্রতি আস্থা ও তাঁর হাতে শর্তহীন আত্মসমর্পণ" হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে তেরেজা বলেন, "যিশু নিজে আমাকে দেখিয়েছেন সেই একমাত্র পথ, যে পথ দিয়ে আমি ঐশরিক প্রেমের জ্বলন্ত চুলায় প্রবেশ করতে পারব, যা হবে শিশুর ন্যায় বিশ্বাস ও পরম নির্ভরতা। যেভাবে একটি শিশু তার বাবার কোলে নির্ভয়ে ঘুমিয়ে আছে।" একটি শিশু নিজের শক্তিতে কোন কিছু করতে পারে না। শিশুকে বাবা-মা কিংবা বড় কারো উপর নির্ভর করতে হয়। ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজা সর্বদা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে যিশুর পথ অনুসরণ করে ক্ষুদ্র জীবন অতিবাহিত করেছেন।

মানুষের আত্মার পরিত্রাণ: ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজা ঈশ্বরের সাথে যুক্ত থেকে উপলব্ধি করেছেন মানুষের আত্মা কষ্ট পাচ্ছে। মানুষ ঈশ্বরের প্রেম সম্বন্ধে সচেতন নয়। মানুষ হেলায়-খেলায়-অবহেলায় তাদের জীবন ধ্বংস করছে। তাই তিনি তাঁর বোন সেলিনকে লিখেছিলেন, "ঈশ্বরের প্রেম এত বেশি নিগূঢ় যে, আমরা সহজে বুঝতে পারি না। ঈশ্বর চান আমরাও যেন তাঁর সঙ্গে মানুষের পরিত্রাণের জন্য কাজ করি।" তাঁর বোনের উৎসাহে আরো বেশি অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি একজন মিশনারির কাছে লিখেছেন, "এসো আমরা একসাথে মিলে মানুষের পরিত্রাণের জন্য কাজ করি। আমি অল্প কিছু করতে পারি, উপরন্তু একা আমি কিছুই করতে পারি না। কিন্তু আমি এই চিন্তা থেকে বড় সান্ত্বনা পাই যে, আপনার পাশে থেকেই

আমি কিছু করতে পারব।” কেননা ফ্রান্সিস জেভিয়ারের সেই বিখ্যাত উক্তিটি- “সমস্ত জগত লাভ করে যদি নিজের আত্মা হারিয়ে ফেল তাতে তোমার কি লাভ”? অর্থাৎ আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং আত্মার পরিত্রাণের জন্য ভাল কাজ করা আবশ্যক।

তেরেজার ক্ষুদ্র পথঃ সাধু বা সাধ্বী হতে অনেক বড় কাজ করতে হয় না বরং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাল কাজগুলো আমাদের মহান করে তুলবে। তেরেজা একদিন তাঁর নির্জনধ্যান পরিচালকের নিকট বলেছিলেন, “ফাদার, আমি সাধ্বী হতে চাই। আমার একান্ত ইচ্ছা যে, অভিলার সাধ্বী তেরেজার মতো, এমন কি তাঁর চেয়েও বেশি ঈশ্বরকে ভালোবাসব।” আমাদের ছোট ছোট ভাল কাজগুলো একটি মালা তৈরি করে এবং এই মালা ঈশ্বরের সাথে একটি বন্ধনে আবদ্ধ হতে সাহায্য করে। প্রতিদিন আমরা যত বেশি ভাল কাজ করি, মঙ্গল চিন্তা করি এবং প্রতিবেশীর কল্যাণে নিবেদিত হই ততবেশি আমরা ঈশ্বরের কাছে যেতে পারি। তেরেজাকে ধন্যা শ্রেণীভুক্ত করার সময় পোপ পঞ্চদশ বেনেডিক্ট বলেন, “তেরেজার ক্ষুদ্র পথ হলো নিজের উপর বিশ্বাস রাখা এবং ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখা।” মানুষ যখন নিজের উপর অত্যধিক বিশ্বাস রাখে সে তখন অহংকারী হয়ে ওঠে। আমরা যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হই তাহলে আমরা ঈশ্বরের কাছের মানুষ হতে পারি।

যবনিকাঃ ছোটবেলা কিংবা শৈশব যৌবনে কেউ সাধু সাধ্বীর তকমা দিলে খুব অপমানবোধ হয়। অথচ এই আমরা জীবনের একটা পর্যায়ে এসে সাধু বা সাধ্বী হতে চাই। বিভিন্ন সাধু সাধ্বীর কাছে হাঁটু গেড়ে জোর মিনতি জানিয়ে প্রার্থনা করি। অবশ্য আমাদের দেশের বাস্তবতায় অন্যকে সাধু বা সাধ্বী বলে আখ্যায়িত করা হয় ঠোঁটে ইষৎ বাকা হাসির রেখা টেনে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে খুব ছোটবেলায় কেউ ভবিষ্যৎ বাণী করে বলেছিল শিশুটি বড় হয়ে সাধু বা সাধ্বী হবে এবং সেটা হয়েও থাকে। সাধু বা সাধ্বী হতে গেলে অনেক বড় কাজ করতে হয় না। ছোট ছোট কাজ হৃদয়ের গভীর ভালোবাসা নিয়ে করলেই সাধু-সাধ্বী হওয়া যায়। আমাদের সামনে জলন্ত উদাহরণ হচ্ছে আমাদের প্রিয় সাধ্বী ক্ষুদ্রপুষ্প তেরেজা। আমরা যদি প্রতিদিন ভাল কাজ করি তাহলে স্বর্গে ঈশ্বরের সাথে, যিশুর সাথে এবং সাধ্বী তেরেজাসহ অন্যান্য সাধু সাধ্বীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারব॥

ঈশ্বরের সৃষ্টি প্রকৃতির পরম বন্ধু আসিসির সাধু ফ্রান্সিস

নিকোলাস ঘরামী সিএসসি

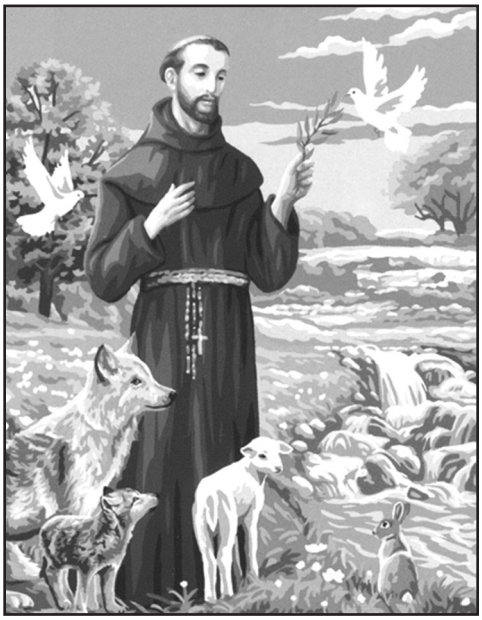

আমাদের পরম পিতা ঈশ্বর তাঁর আপন সৌন্দর্য্য ও ভালোবাসায় অপূর্ব সুন্দর এই প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন। তিনি শুধু প্রকৃতি সৃষ্টি নয় বরং এই চির লাবণ্যময় প্রকৃতির সৌন্দর্যের দায়িত্বভার তুলে দিয়েছেন তাঁরই আপন সাদৃশ্যে গড়া শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের হাতে। আর তাই আদম ও হবা থেকে শুরু করে আজ অবদি মানুষ ঈশ্বরের ভালোবাসার সৃষ্টি প্রকৃতির যত্ন নিয়ে আসছে। যদিও এখন অনেক মানুষ পাওয়া যায় যারা প্রকৃতির ধ্বংস বা বিনাশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তবে সমাজে অনেক ভালো মানুষ এখনো আছে যারা প্রকৃতিকে ভালোবেসে সর্বদাই প্রকৃতির যত্ন নিয়ে থাকে। যারা ঈশ্বরের সৃষ্টি প্রকৃতির প্রেম ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ ছিলেন তাদের মধ্যে আসিসির সাধু ফ্রান্সিস ছিলেন অন্যতম। কারণ সাধু ফ্রান্সিস বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বর তার সৃষ্ট প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যদিয়ে আমাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন। তাই আমাদের এই প্রকৃতির প্রতি যত্নবান হওয়া খুবই প্রয়োজন।

প্রতি বছর ৪ অক্টোবর মণ্ডলীতে আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টি প্রকৃতির পরম বন্ধু আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের পর্ব পালন করে থাকি। সাধু ফ্রান্সিস ১১৮১ খ্রিস্টাব্দে ইতালির অ্যাসিসিতে পিয়েত্রো ডি বার্নাড্রোন নামক একজন ধনী কাপড় ব্যবসায়ীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার জন্মের সময়, তার বাবা ব্যবসায়িক সফরে ফ্রান্সে ছিলেন। তখন তার মা শিশুটিকে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন, কিন্তু যখন তার বাবা ফিরে আসেন, তখন তিনি শিশুর নাম পরিবর্তন করে ফ্রান্সেসকো রাখেন। যেহেতু ফ্রান্সিস একজন ধনী বণিকের পুত্র ছিলেন, তাই তার বাবা ফ্রান্সিসের ছোটবেলা থেকেই আশা করেছিলেন যে ফ্রান্সিস বড় হয়ে পারিবারিক কাপড়ের ব্যবসার দায়িত্ব নেবে। তবে ফ্রান্সিস কাপড়ের ব্যবসায় আগ্রহী ছিলেন না। তিনি ছোটবেলা থেকেই একজন যোদ্ধা বা সৈনিক হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, ঠিক যেন মধ্যযুগীয় যুদ্ধের যোদ্ধাদের মতো। তাইতো ১২০২ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সিস পেরুজা এবং আসিসির মধ্যে একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণও করেছিলেন। আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের জীবনে অনেক বার পরিবর্তনকারী ঘটনা ঘটেছিল, আর প্রতিটি ঘটনায় ঈশ্বরের পরিকল্পনার কথা তার কাছে ব্যক্ত হয়েছে। একবার তিনি যখন গ্রামের মধ্যদিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন সেই সময় একজন কুষ্ঠরোগীর সম্মুখীন হন। যদিও তিনি পূর্বে কুষ্ঠরোগীদেরকে এড়িয়ে যেতেন। এবার তিনি অনুভব করেছিলেন যে লোকটি তার জন্য ছিল নৈতিক বিবেকের এক জীবন্ত প্রতীক। তাই ফ্রান্সিস কুষ্ঠরোগীর কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন। সেই মুহূর্তে তিনি অনুভব করেছিলেন যে তার জীবনে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য্য মরিচিকা বা মোহ ছাড়া আর কিছু নয়। তাই তিনি যে সম্পদ ক্ষণস্থায়ী তা ত্যাগ করে চিরস্থায়ী সম্পদের প্রতি মনোনিবেশ করেন। সেই সাথে জীবনে সকল পরিস্থিতিতে সকল প্রয়োজনের জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল হতে শুরু করেন। আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের আধ্যাত্মিক জীবনে প্রভু যিশুখ্রিস্ট ও তাঁর সকলের জন্য ক্রুশে মৃত্যু ছিল প্রধান অনুপ্রেরণা ও শক্তি। তাই তো যখনই তার জীবনে কোন চরম মুহূর্ত আসতো তিনি ক্রুশবিদ্ধ যিশুর কাছ থেকে শক্তি গ্রহণ করতেন। আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের চরম ক্রুশ ভক্তির পুরস্কার স্বরূপ তিনিই ১২২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম যিশুর পঞ্চক্ষত নিজের শরীরে লাভ করেছিলেন।

আসিসির সাধু ফ্রান্সিস একাধারে ছিলেন যিশু প্রেমের জীবন্ত প্রতীক, একইসাথে ঈশ্বরের অপূর্ব সৃষ্টি প্রকৃতির লাবণ্যময়ী রূপের মহান প্রেমী। সেজন্য আমাদের মাতা মণ্ডলী এই

মহান সাধুকে তার প্রকৃতি ও যিশু প্রেমকে শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রকৃতির প্রতিপালক সাধু হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। একজন প্রতিপালক সাধু হলেন একটি স্থান, দেশ বা ব্যক্তির পথপ্রদর্শক বা আধ্যাত্মিক রক্ষাকারী সাধু। আসিসির সাধু ফ্রান্সিস সিয়েনার সাধ্বী ক্যাথরিনের পাশাপাশি ইতালির প্রতিপালক সাধুসাধ্বীদের একজন। তিনি তার অনেক অলৌকিক কাজের জন্য সুপরিচিত ছিলেন যেমন পশুপাখিদের সাথে বন্ধুত্ব এবং গুরুতর অসুস্থ ও আহত ব্যক্তিদের নিরাময় করার জন্য তার অনেক আধ্যাত্মিক সুনাম ছিল। আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের ঈশ্বরের প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম এবং ঈশ্বরের বাণী ও ঐশ করুণা উপর ছিল গভীর আস্থা। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর ভালোবাসা এতটাই গভীর ছিল যে এটি তাকে সমস্ত প্রাণীর প্রতি সমবেদনাশীল হতে সাহায্য করেছিল। মানুষ থেকে শুরু করে পশু-পাখি এবং এমনকি শিকারী, যেমন নেকড়ে সব কিছুর প্রতি তার হৃদয়ে গভীর মমত্ববোধ ছিল। তার সারা জীবন ধরে, সাধু ফ্রান্সিস ঈশ্বরের সমস্ত প্রাণীকে তার বিশ্বাসের ভাই এবং বোন হিসাবে দেখেছিলেন। সাধু ফ্রান্সিসের সবচেয়ে পরিচিত অলৌকিক কাজের মধ্যে একটি হল পশু এবং পাখিদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করার ক্ষমতা। সাধু ফ্রান্সিস দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বরের সৃষ্টি সমস্ত প্রাণীই করুণার যোগ্য। তাই তিনি প্রায়শই পশু-পাখিদের কাছে প্রভুর বাণী প্রচার করতেন। আর এভাবেই আসিসির সাধু ফ্রান্সিস সমস্ত প্রাণীর সাথে এক বন্ধুত্বের বন্ধন গড়ে তুলেছিলেন। তবে পাখিদের জন্য সাধু ফ্রান্সিসের বিশেষ মনোযোগ ছিল। কথিত আছে, অনেক পাখি তাকে প্রায়শই অনুসরণ করতো, তার উপদেশ শুনতো এমনকি তার কাঁধ এবং হাতের উপর এসে বসতো। যেহেতু পাখিরা বৃদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার প্রতীক, তাই অনেক লোক বিশ্বাস করতেন যে আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের ধর্মোপদেশ শোনা পাখিদের অলৌকিক ঘটনা হলো ঈশ্বরের একটি চিহ্ন। একদিন, ফ্রান্সিস লক্ষ্য করলেন এক ঝাঁক পাখি তাকে দেখতে আসছে এবং ঈশ্বরের ভালোবাসা এবং করুণা সম্পর্কে একটি স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মোপদেশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পাখিরা উপস্থিত এবং মনোযোগী ছিল, আপাতদৃষ্টিতে তার প্রতিটি শব্দ শুনছিল। ধর্মোপদেশের পরে, ফ্রান্সিস পাখিদের আশীর্বাদ করলেন এবং তারা উড়ে গেল। গল্পের মতো, পাখিরা বাকি বিশ্বের সাথে ঈশ্বরের বাণী এবং ভালোবাসা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিটি দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। সাধু ফ্রান্সিসের মধ্যদিয়ে সংঘঠিত অলৌকিক ঘটনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি অলৌকিক ঘটনা হল একটি নেকড়েকে শান্ত করা। যাতে নেকড়েটি আম্ব্রিয়ান শহর গুবিওতে আক্রমণ এবং হত্যা করা বন্ধ করা। আসিসির সাধু ফ্রান্সিস শহরবাসী এবং নেকড়েদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, নেকড়েকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে মানুষ তাকে খাবার সরবরাহ করবে, যদি সে আবার কোন প্রাণী বা ব্যক্তির ক্ষতি না করতে রাজি হয়। এই অলৌকিক ঘটনার পরে, নেকড়েটি দুই বছর ধরে সেই শহরে বাস করেছিল এবং খাবারের জন্য বাড়িতে বাড়িতে প্রবেশ করতো। পরবর্তিতে নেকড়েটি আর কখনও মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষতি করেনি। শেষে বার্ধক্যজনিত কারণে নেকড়েটি মারা গেলে, শহরবাসী বরং তাদের প্রিয় সঙ্গীকে হারিয়ে শোকাহত হয়েছিল।

আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের মধ্যে রয়েছে কুষ্ঠরোগীদের যত্ন নেওয়া এবং পঞ্চম ক্রুসেডের সময় খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে শান্তি আলোচনার চেষ্টা করা। একইসাথে তার অনেক অলৌকিক ঘটনার মধ্যে গুরুতর অসুস্থ বা আহত ব্যক্তিদের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক নিরাময়ের বিষয়ও জড়িত ছিল। একবার তিনি যখন একজন কুষ্ঠরোগীকে সেবা করছিলেন এবং তার ঘাঁ ধুয়ে দিচ্ছিলেন তখন তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যেন ঈশ্বর এই কুষ্ঠরোগীকে শারীরিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তি দান করেন। ঈশ্বরও আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের প্রার্থনা শুনেছিলেন, কুষ্ঠরোগীটি শারীরিকভাবে নিরাময় লাভ করেছিল এবং নিজের পাপের জন্য অনুশোচনা ও অনুতাপ করেছিল। আর এভাবে সাধু ফ্রান্সিসের মধ্যদিয়ে তার প্রার্থনা ও উপদেশে অনেক পাপী মন পরিবর্তন করে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সাথে আবার মিলিত হয়েছে।

আসিসির সাধু ফ্রান্সিস নিজে যেমন করতে তেমনি অন্যদের নির্দেশ দিতেন যাতে তারা সকলের প্রতি দয়ালু মনোভাব প্রদর্শন করেন। এমনকি অপরাধীদেরও প্রতি ভালো আচরণ, নম্রতা এবং খাবার পরিবেশন করতে যতক্ষণ না তারা সন্তুষ্ট হয়। ডাকাত এবং খুনিদের একটি পুষ্টিকর খাবার পরিবেশন করার পরে, সাধু ফ্রান্সিস তাদেরকে অন্যদের আঘাত করা বন্ধ করতে বলতেন। তিনি তাদের এই অনুপ্রেরণা দিতেন যে ঈশ্বরের সেবা করা তাদের পেশার চেয়ে অনেক বেশি সহজ এবং ফলপ্রসূ হবে। কারণ আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের এই বিশ্বাস ছিল যে প্রভু এই ব্যক্তিদের আরও ভাল জীবনযাপন করতে অনুপ্রাণিত করবেন। পরবর্তিতে পুরুষরা সাধু ফ্রান্সিসকে সৎ এবং বিশ্বস্ত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং সবাই ফ্রান্সিসকান সংঘে প্রবেশ করেছিল, যেখানে তারা তাদের বাকি দিনগুলি সেবা ও দয়ার কাজে উৎসর্গ করেছিল।

আমরা আসিসির সাধু ফ্রান্সিসকে অনেক বিষয়ের জন্য স্মরণ করি, কিন্তু তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদানগুলির মধ্যে একটি হল বড়দিনে যিশুর জন্মের দৃশ্যপঠ বা গোশালা তৈরি করা। সাধু ফ্রান্সিস প্রথম যিনি বড়দিন বা গোশালা থেকে মানুষকে ঈশ্বরের অলৌকিক কাজগুলি উপলব্ধি করতে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। তিনি যিশুর জন্মের দৃশ্যপট বা গোশালা প্রবর্তন করার আগে, লোকেরা বড়দিন বা যিশুর জন্মতিথি উদ্‌যাপন করত বড়দিনের মাসে পুরোহিতদের কাছে গিয়ে গল্প শোনার মাধ্যমে, যা অনেক লোকই বলতে বা বুঝতে পারতেন না। যদিও বড়দিনে মণ্ডলী তখনও যিশুকে শিশু হিসেবেই চিত্রায়িত করত, কিন্তু সেখানে এমন কোন বাস্তবসম্মত দৃশ্য বা চিহ্ন ছিল না যা দেখে সাধারণ মানুষ আরো গভীর ভাবে যিশুর জন্ম নিয়ে ধ্যান করতে পারে। আসিসির সাধু ফ্রান্সিসই আমদের প্রভু যিশুখ্রিস্টের প্রতি তার ভালোবাসা এবং ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টির জন্য উপলব্ধি ব্যবহার করে প্রথম যিশুর জন্মের একটি আধ্যাত্মিক অর্থপূর্ণ দৃশ্যপট বা গোশালার আধ্যাত্মিক চিত্র তৈরি করেন। আর এর মধ্যদিয়ে তিনি স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যেকার একটি অসাধারণ অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন যা পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনেরই কথা সকলকে অবগত করে।

পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে দায়িত্ব থেকে অব্যহতি নেবার পর, কার্ডিনাল জর্জ বার্গোগিওকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। নব নির্বাচিত পোপ মহোদয় আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের সম্মানে তার নতুন নাম ফ্রান্সিস বেছে নিয়েছিলেন, কারণ আসিসির সাধু ফ্রান্সিস একজন শান্তির মানুষ, যিনি ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টিকে ভালোবাসতেন এবং রক্ষা করেছিলেন। আমাদের বর্তমান পোপ ফ্রান্সিসও সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দরিদ্রদের জন্য তার উদ্বেগ, নম্রতা এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপের প্রতি অঙ্গীকারের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছেন।

পরিশেষে বলতে চাই, আসিসির সাধু ফ্রান্সিস তাঁর জীবনের মধ্যদিয়ে আমাদের এই অনুপ্রেরণা দেয় যে আমরাও যেন ঈশ্বরের ভালোবাসার অপূর্ব সৃষ্টি এই প্রকৃতিকে ভালোবাসি। কারণ ঈশ্বর এই সবই আমাদের মঙ্গলের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সাধু ফ্রান্সিস যেমন সূর্যকে ভাই আর চাঁদকে বোন হিসেবে দেখতেন, তেমনি আজ মণ্ডলী আমাদের বলছেন আমরা যেন ঈশ্বরের সৃষ্টি এই সুন্দর পৃথিবী ও পৃথিবীর সকল কিছুকে আপন করে নেই। সেই সাথে যা আমাদের এই মাতৃস্বরূপ প্রকৃতির অন্তরায় তা থেকে দূরে থাকি। তাহলেই আমরাও আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের মতো প্রকৃতির বন্ধু হতে পারব। আসিসির সাধু ফ্রান্সিস আমাদের সেই অনুপ্রেরণাই দান করুণ।

তথ্যসূত্র:

1. https://catholicworldmission.org/who-is-saint francis/#:,:text=Catherine%20of%20Sienna.-,St.,animals%2C%20their%20lives%20and%20welfare.
2. https://www.newadvent.org/cathen/06221a.htm

শিক্ষকের প্রতি মর্যাদা ও ভালোবাসা

সিস্টার মমতা ভূইয়া এসসি

শিক্ষক দিবসের ইতিহাস:

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ড. সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণণ ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে বহাল ছিলেন। শোনা যায়, কয়েকজন ছাত্র বন্ধু-বান্ধব প্রখ্যাত শিক্ষাবিদের জন্মদিন পালন করতে চেয়েছিলেন। সেই সময় রাধাকৃষ্ণ জানিয়ে দিলেন তার জন্মদিন আলাদাভাবে পালন না করে সেই দিনটি দেশের সব শিক্ষকের জন্য পালন করা হলে তিনি গর্ববোধ করবেন। এই আবেদন শিক্ষকদের প্রতি তার ভালোবাসা ও সম্মানকেই প্রকাশ করে। তাই ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ৫ সেপ্টেবর থেকে ড. রাধাকৃষ্ণণর জন্মদিন শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। তিনি বিশ্বাস করতেন দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিদেরই শিক্ষক হওয়া উচিত। ড. সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণেণের বাবা তার ইংরেজি শিক্ষক ও স্কুলে যাওয়ার বিরোধী ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, ছেলে পুরোহিত হোক। মেধাবী ড. রাধাকৃষ্ণণ নিজের অধিকাংশ পড়াশোনাই ছাত্রবৃত্তির সাহায্যে শেষ করেছিলেন। তিনি পড়ুয়াদের মধ্যে এতটাই জনপ্রিয় ছিলেন যে, তার কলকাতা যাওয়ার সময় তাকে ফুলের সাজানো গাড়িতে করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রেল স্টেশন পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। প্রখ্যাত অধ্যাপক এইচএন স্পেলডিঙ্গ ড. রাধাকৃষ্ণণের ভাষণের এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তার জন্য চেয়ার স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অবদানের জন্য ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার তাকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন।

শিক্ষক দিবস সম্পর্কে কিছু জানা-অজানা তথ্য:

৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস হিসেবে পালিত হয়। জার্মানি, ইংল্যান্ড, রাশিয়া, রোমানিয়া, সার্বিয়ার মতো কয়েকটি দেশে সেই দিনে শিক্ষক দিবস পালন করা হয়। তাছাড়া বিশ্বের ১০০ টির ও বেশি দেশে পৃথক পৃথক তারিখে শিক্ষক দিবস পালিত হয়। ২৮ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত হয় লিবিয়া, মরক্কো, আলজেরিয়া, সংযুক্ত আরব, আমিরশাহির মতো দেশে। শিক্ষকদের অবদানকে সম্মান জানাতে ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালন শুরু করে ইউনেস্কো। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা মৈটে ওয়ায়েটে উডব্রিজ সর্বপ্রথম শিক্ষক দিবসের পক্ষে সম্মতি দান করেন। পরে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন কংগ্রেস তাতে সায় দেয় এবং ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭ মার্চ শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করা শুরু হয়। সিঙ্গাপুরে সেপ্টেম্বরের প্রথম শুক্রবার শিক্ষক দিবস হিসেবে পালিত হয়। আফগানিস্তানে ৫ অক্টোবরই এই দিনটি পালিত হয়।

বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে সকল শিক্ষকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাতেই আমার ক্ষুদ্র প্রয়াস। আমরা জানি সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে একজন শিক্ষকের ভূমিকা অনেক। তিনি একাধারে জাতির আলোক-বর্তিকা। অপরদিকে মানব জাতির ভবিষ্যতের রূপকার স্বরূপ। পিতামাতার পরেই শিক্ষকের স্থান। একজন শিক্ষককে বলা হয় দ্বিতীয় জন্মদাতা। পিতামাতা সন্তানকে জন্মদান করেন কিন্তু শিক্ষকের হাত ধরে সে বই এর জগতে প্রবেশ করে। এ স্তরে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই শিক্ষকের প্রতি অগাধ আনুগত্যের নমুনা অতীত পর্যালোচনা করলে পাওয়া যায় যে, যুগে যুগে ব্যক্তিরা তাদের শিক্ষদের প্রতি গুরুভক্তি ও শ্রদ্ধাশীল দেখাতে পিছু পা হন নি। তখন শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে সম্মান করতে এবং শিক্ষকের প্রতি মর্যাদা রক্ষায় ছিল নিবেদিত প্রাণ। শিক্ষক শুধু শিক্ষার্থীর কাছেই সম্মানের পাত্র নন সেই সঙ্গে প্রতিটি শ্রেণির মানুষের কাছেই শিক্ষকের মর্যাদা সবার উর্ধ্বে। কারণ একজন শিক্ষকের বলিষ্ঠ পদক্ষেপে একটি শিক্ষার্থী পায় কর্মজীবনের দিক-নির্দেশনা। সেই সঙ্গে জাগ্রত হয় তার নৈতিক বিচার-বুদ্ধি ও বিবেক। আমরা স্বীকার করি বা না করি প্রতিটি শিক্ষার্থীর জীবন গড়ার পিছনে একজন শিক্ষকের থাকে প্রচেষ্টা ও ত্যাগ। এমনকি একজন শিক্ষার্থীর কর্ম জীবনে সাফল্যের ভিত্তি রচিত হয় শিক্ষকের একান্ত প্রচেষ্টায়।

এ বিষয়ে আমার ব্যক্তি জীবনের একটি সত্য ঘটনা উল্লেখ করতে চাই। ২০১২ খ্রিস্টাব্দ। আমি খুলনা থেকে চাটমোহর যাব। অসুবিধার কারণে আমাকে ঈশ্বরদী নামতে হয়। আমি আমার লাগেজ নিয়ে ওভার ব্রিজ পার হচ্ছিলাম। হঠাৎ পেছন থেকে একটি যুবক ছেলে কিছু না বলে আমার হাত থেকে লাগেজটি নিয়ে নেয় এবং পায়ে পড়ে সালাম জানায়। অপ্রত্যাশিত এ ঘটনায় আমি প্রথমে রীতিমত ভয় পেয়ে যাই। পরে আমি যুবকটির দিকে তাকাই কিন্তু চিনতে পারিনি। ছেলেটি আমার হাত ধরে বলে, "সিস্টার আমি শুভ! আমি সেই শুভ যে নাকি ক্লাশে খুব দুষ্টামী করত, আমার কারণে আপনার ক্লাশ নিতে ব্যাঘাত ঘটত। আপনি আমাকে কত শাস্তি দিয়েছেন, কান ধরে হাঁটু গেড়ে রেখেছেন। জানেন সিস্টার, আপনার শাসন ও ভালোবাসার কারণে আমি আজ মানুষ হয়েছি। আমি এখন রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজীতে মাস্টার্স করছি।" শুভর ইতিবাচক মনোভাব দেখে আমার দু'চোখ ঝাপসা হয়ে আসে পুরানো স্মৃতি স্মরণ করে। আমি শুভর হৃদয়ে শিক্ষকের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ দেখে অবাক হই এবং তুলনা করি বর্তমান প্রজন্মের শুভদের সাথে।

আসলে শিক্ষককে যথাযথ মর্যাদা দেয়া, সম্মানবোধ জাগ্রত করা পরিবারের উপর নির্ভরশীল, কারণ পরিবার হলো শিক্ষার্থীর প্রথম বিদ্যালয় এবং আদব-কায়দা শিক্ষার ভিত্তি। শিক্ষাহীন পরিবার ও মা-বাবা, আমাদের দেশে শিক্ষিত মা-বাবা ও পরিবার শিশুকে সঠিক ভাবে পরিচালনা করতে পারে না। সন্তানের ভুল থাকা সত্ত্বেও পিতামাতা তাদের কথা শুনেন ও সমর্থন করেন। এতে করে শিক্ষকের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধ হারায়। প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললেই আমাদের নজরে পড়ে শিক্ষকের প্রতি অবমাননা, অপমান-নির্যাতন। যেমন: শিক্ষকের গলায় জুতার মালা পরানো, শিক্ষিকার চুল কেটে দেয়া, নিযার্তন, খুন এবং অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করে লাঞ্ছিত করা। একজন শিক্ষককে অপমান মানে একটি জাতিকে অপমান করা হয়। একজন শিক্ষকের অবদান অর্থ দিয়ে কেনা যায় না ও তার ঋণ শোধ করা যাবে না কোন কিছুর বিনিময়ে। শুধুমাত্র হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায়। গর্বের সাথে বলতে হয় আজ যারা ভাল মানুষ হয়েছে তারা সবাই শিক্ষকের হাতে গড়া মানুষ, তার দেয়া বিদ্যা-বুদ্ধি ও ত্যাগের সার্থক ফসল। বর্তমান প্রজন্মের কিছু শিক্ষার্থীর এমন নিন্দনীয় আচরণে শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীর সম্পর্কের টানাপোড়েন দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। তাদের নৈতিক অবক্ষয় দেখা যাচ্ছে অহরহ। বর্তমান সময়ে শিক্ষকের যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে অনীহা পরিলক্ষিত হচ্ছে। আজ সেটাই তাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়। শিক্ষার্থীর অশ্লীল আচরণে দেশ অন্ধকারের দিকে ধাবিত হতে পারে তা আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারব না। যেখানে ব্যক্তির মর্যাদা বা সম্মান নেই সেখানে ভাল কিছু আশা করা যায় না। এখন কেবল মুখ দিয়ে উপদেশ দিয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগানো যাবে না। বর্তমানে শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি আর্কষণ খুবই কম। তবে শিক্ষকের প্রতি অসম্মান ও মর্যাদার অভাবে শিক্ষকের ছাত্রত্ব শেষ হয় না বরং ছাত্রদের ছাত্রত্ব শেষ হয়ে যায়। অনেক সময় সত্যতা যাচাই করতে গেলে শিক্ষককে শিক্ষার্থীর হাতে লাঞ্ছনা পেতে হয় এবং বিচারের কাঠ গড়ায় দাঁড়াতে হয়।

বর্তমানে শিক্ষাক্রমের পরিবর্তন অপরদিকে করোনার প্রতিফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদাসীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, পড়ার টেবিলে তারা বসতে চায় না। তাদের কথা-বার্তা চাল-চলন এবং আচার-আচরণের ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। এ পরিস্থিতিতে শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ এক কঠিন অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে পড়ে যায়। লক্ষ্যণীয় যে, একজন শিক্ষার্থী লেখাপড়া না

করে টাকার বিনিময়ে পাশের সার্টিফিকেট পেয়ে যাচ্ছে, সেখানে শিক্ষকদের মান সম্মান ও মর্যাদা কতটুকু থাকতে পারে বিবেচনা করার বিষয়।

পরিশেষে আমি মনে করি নৈতিক গুণাবলী অর্জনের প্রাথমিক মাধ্যম হলো পরিবার। কারণ নৈতিক শিক্ষা ও অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ শিখনের সূত্রপাত ঘটে পরিবার থেকেই। পারিবারিক শিক্ষার অভাবে সন্তানেরা অশ্লীল ও মন্দ আচরণ, নেশাগ্রস্থ, কুসঙ্গ ও বিভিন্ন পাপ কাজে অভ্যস্থ হয়ে পরছে। এখানে শুধু পরিবারকে দোষ দিলেও ঠিক হবে না। বর্তমান প্রজন্মের সন্তানেরা পিতামাতা বা বড়দের কথা শুনতে ও মানতে চায় না। অপরদিকে প্রযুক্তির অপব্যবহারের কারনে তারা বিপথে পা বাড়াচ্ছে এবং অসামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। আমি মনে করি এ ব্যাধি থেকে উত্তরণের জন্য পারিবারিক সুশিক্ষা, ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত ও সন্তানের পাশে থাকা একান্ত প্রয়োজন। একজন শিক্ষককে পিতামাতার স্থানে রেখে তার মর্যাদা রক্ষা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য বলে মনে করি। সুতরাং ভাল মানুষ গড়ার কাজে প্রত্যেকের প্রয়োজন আন্তরিকতা, ভালোবাসা ও সচেতনতা।

শিক্ষক দিবস উপলক্ষে রইল বিশেষ কিছু উক্তিঃ

১। "মনে রাখবেন একটা বই, একটা পেন, একজন বাচ্চা এবং একজন শিক্ষক সারা বিশ্বের ছবিটাই বদলে দিতে পারে"- *মালালা ইউসুফজাই*।

২। "একজন সাধারণ শিক্ষক যেখানে শুধু কান বন্ধ করে পড়িয়ে যান, সেখানে একজন আদর্শ শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেন। শুধু তাই নয়, পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাও একজন প্রকৃত শিক্ষকের প্রথম এবং প্রধান কাজ"- উইলিয়াম আর্থার ওয়ার্ড।

৩। "একজন প্রকৃত শিক্ষক সেই, যিনি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ভালোবাসে পড়াশোনা করতে অনুপ্রাণিত করেন। ব্যর্থতার দিনে পাশে থাকেন এবং পড়াতে পড়াতে ছাত্রদের কাল্পনিক শক্তিকে বাড়িয়ে তোলেন"-*ব্র্যাড হেনরি রিড*।

৪। "খুব ছোট বয়স থেকেই শিক্ষক-শিক্ষিকারা বাচ্চাদের ঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যায় বলেই সমাজ ভুল পথে যাওয়ার সুযোগ পায় না। বাচ্চারা বড়দের সম্মান করতে শেখে। সমাজ এবং দেশকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় সেই জ্ঞান লাভ করে। তাই তো এত যুদ্ধ এবং দাঙ্গার পড়ে এই পৃথিবী শেষ হয়ে যায়নি"-*সক্রেটিস*।

৫। "শিক্ষকতা আর পাঁচটি পেশার মতো নয়। কারণ শিক্ষক কোন সফল ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং বিজ্ঞানীর পিছনে যে একজন শিক্ষকের অবদান রয়েছে। সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই"-*নরেন্দ্র মোদী*।

৬। "শিক্ষক-শিক্ষিকাকে প্রশ্ন করতে ভয় পাবেন না। কারণ, প্রশ্ন করলে তবেই জ্ঞানের বিকাশ ঘটবে"-*আলবার্ট আইনস্টাইন*।

৭। "শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ সারা জীবন তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করেন। তাই তো সমাজ গঠনে এদের অবদানকে দারিপাল্লায় মাপা মুর্খামি ছাড়া আর কিছুই নয়"- *হেনরি অ্যাডামস্*।

৮। "নতুন কিছু শেখার সময় আমাদের মস্তিস্ক না ভয় পায়, না ক্লান্ত হয়ে পরে। বরং প্রতিদিনই নতুন উদ্যমে কিছু না কিছু শিখে চলে। তাই তো শেখার ইচ্ছাকে মেরে ফেলাটা পাপ"- লিওনার্দো দা ভিঞ্চি।

৯। "চক এবং চ্যালেঞ্জ এই দুয়ের মিশ্রনে যে কোন সময়ই যে কোন শিক্ষক, যে কারও জীবন বদলে দিতে পারে।

১০। "যে কোনও স্বাধীন দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে একজন আদর্শ এবং অধ্যবসায়ের উপর"। (সংগ্রহ)

আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ার কারণ ও প্রতিকারের কতিপয় সুপারিশ

ড. আলো ডি'রোজারিও

১। দুই হাজার পনের-ষোল খ্রিস্টাব্দের কথা। আমি তখনো কারিতাসে কর্মরত। প্রতিবেশি দেশ ভারতের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কৃষকদের আত্মহত্যার খবর একটার পর একটা বের হতে থাকলে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছিল- বন্যা, খরা ও কীট পতঙ্গের আক্রমণ জনিত বহুবিধ কারণে কৃষকরা ফসল ঘরে তুলতে পারেন নি। তাই তারা তাদের ঋণের কিস্তি সময় মতো দিতে পারছিলেন না। ঘরে মজুদ রাখা খাবারও শেষ হয়ে গিয়েছিল। ফসল হানিতে পরিবারের সদস্যদের তারা কী খেতে দিবেন, তদুপরি ঋণ কীভাবে ফেরত দিবেন, এইরূপ একাধিক দুশ্চিন্তা থেকে উদ্ভূত হতাশার কারণে কৃষকদের কেউ কেউ আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিলেন। ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিবর্গ কৃষকদের এই ধরনের আত্মহত্যা প্রতিরোধে দু'টি ত্বরিত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন- বিনামূল্যে কয়েক মাসের জন্যে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের খাবারের যোগান দিয়ে ও সাময়িকভাবে কৃষকদের ঋণের কিস্তি ফেরতদান বন্ধের নির্দেশ দান করে। ফলস্বরূপ, আত্মহত্যার সংখ্যা তখন কমে গিয়েছিল উল্লেখযোগ্যভাবে। ভারতের কৃষকদের আত্মহত্যা প্রতিরোধের এই বিষয়টা লেখার শুরুতেই উল্লেখ করার কারণ- যেকোন বড় সমস্যাই সমাধানযোগ্য এবং প্রতিরোধ করাও সম্ভব।

২। প্রতি বছর ১০ সেপ্টেম্বর বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস হিসেবে বিভিন্ন দেশে পালন করা হয়। এই দিবস পালন উপলক্ষে বর্তমান বছরে প্রকাশিত আত্মহত্যা বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিবেদন ও লেখা পাঠে উদ্বিগ্ন হয়ে এই লেখা লিখছি। বিশ্বব্যাপী আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রের মতো ধনী দেশেও বাড়ছে আত্মহত্যার সংখ্যা। সেখানে আত্মহত্যার মোট সংখ্যার শতকরা হার মহিলাদের চেয়ে পুরুষদের মধ্যে বেশি। আমাদের দেশে তরুণদের আত্মহত্যা প্রবণতা বাড়ছে। দৈনিক সমকালে কানিজ ফাতেমা লিখেছেন, বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে আত্মহত্যার প্রবণতা ব্যাপকভাবে বেড়ে চলেছে। বাংলাদেশে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে আত্মহত্যার সংখ্যা ছিল ১০ হাজার; পরের বছর ২০২০ খ্রিস্টাব্দে তা বেড়ে ১৪ হাজারেরও বেশি হয়। ২০১৯ ও ২০২০, এই দুই বছরের হিসেব অনুযায়ী, আত্মহত্যাকারীর এই সংখ্যা একই সময়ের করোনায় মোট মৃত্যুর সংখ্যার চেয়েও বেশি ছিল। *(সমকাল, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩)*। সেই একই লেখায় তিনি আঁচল ফাউন্ডেশনের আত্মহত্যা বিষয়ক জরীপ প্রতিবেদনের বিভিন্ন তথ্য উল্লেখ করেছেন। আঁচল ফাউন্ডেশনের ৯ সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ৫৩২ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন; তাদের মধ্যে স্কুল ও কলেজের ৪৪৬ জন এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ৮৬ জন। আর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি হতে আগস্ট, এই আট মাসে ৩৬১ জন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাদ্রাসা শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন; গত আট মাসে গড়ে আত্মহত্যা করেছেন ৪৫.১৩ জন শিক্ষার্থী।

৩। আঁচল ফাউন্ডেশনের জরীপ হতে সারাদেশের শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার একটি চিত্র পাওয়া গেছে। তাদের এই জরীপের ভিত্তি ১০৫টি জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকা এবং অনলাইন পোর্টাল প্রকাশিত আত্মহত্যা বিষয়ক তথ্য। আত্মহত্যা বিষয়ক সব তথ্য সামাজিক, ধর্মীয় ও পারিবারিক কারণে পত্রিকায় ছাপা হয় না। তাই এটা ধরে নেয়া যায়, প্রকৃত আত্মহত্যার সংখ্যা আরো বেশি। জাতীয় পর্যায়ের আত্মহত্যার পরিসংখ্যান আলোচনার পাশাপাশি আমাদের খ্রিস্টান সমাজের আত্মহত্যার পরিসংখ্যান আলোচনা করার সুযোগ তেমন নেই বললেই চলে। কারণ খ্রিস্টান সমাজের এই জাতীয় গুরুতর মন্দ ও নেতিবাচক বিষয়ে আমরা 'গোপনীয়তা ও নীরবতার সংস্কৃতি' মেনে চলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। গ্রামে বা শহরে আমাদের সমাজের যেখানেই আত্মহত্যার ঘটনা ঘটুক না কেন আমরা পুলিশসহ অন্যান্য ঝামেলা এড়াতে ও পরিবারের সম্মান বাঁচাতে গোপনে অনেক কাজ সেরে

ফেলি। তাৎক্ষণিকভাবে সেটা ভালো মনে হতে পারে কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে সমাজের জন্যে এই ধরনের গোপনীয়তা ও পদক্ষেপ ক্ষতিকর প্রভাব আনবেই আনবে; কেউ হয়ত হত্যাকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দিয়ে পার পেয়ে যাবেন, আবার সমাজ হয়ত বঞ্চিত হবে অবাধ তথ্য প্রবাহ হতে যা কী না খুবই প্রয়োজন সমস্যার গভীরতা, ধরন ও কারণ বিশ্লেষণে, আর এইসবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ সচেতনতা আনতে, গুরুতর মন্দতার প্রতিকারার্থে।

৪। বিভিন্ন সূত্র হতে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আত্মহত্যার যেসব খবর আমি নিজে পেয়েছি তাতে আমার ধারণা আমাদের খ্রিস্টান সমাজের তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী ও নবদম্পতিদের মধ্যেও আত্মহত্যার প্রবণতা দ্রুত ও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে। আমার ধারণা কতটুকু সঠিক তা জানতে সমাজ নিয়ে ভাবেন এমন কয়েকজনের সাথে আলাপ করে এবং কয়েকটি প্রবন্ধ ও নিবন্ধ পড়ে এই লেখাটিতে আত্মহত্যার লক্ষণ, কারণ ও প্রতিকারের ওপর অল্পকিছু সহভাগিতা করলাম। আত্মহত্যাপ্রবণ ব্যক্তি কোনো না কোনোভাবে আত্মহত্যা করার আগে কিছু সংকেত দিয়ে থাকেন। এইসব পূর্বসংকেত জানা থাকলে আগে থেকেই সচেতন হওয়া যায় ও মূল্যবান প্রাণ বাঁচাতে সহযোগিতা করা যায়। পূর্বসংকেতগুলো হতে পারে-

- মৃত্যু বা আত্মহত্যা বিষয়ে কথা বলা;
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মৃত্যু বিষয়ে লেখালেখি বা স্ট্যাটাস দেয়া;
- আত্মহত্যা করার উপাদান (ঘুমের ঔষধ, রশি, ছুরি, ইত্যাদি) যোগাড় করা;
- একা থাকা, একাকিত্ব বোধ করা, হঠাৎ করে চুপ হয়ে যাওয়া;
- আত্মীয়স্বজনের সাথে হঠাৎ করে যোগাযোগ কমিয়ে দেয়া;
- লোকজনের কাছে ক্ষমা চাওয়া, বা বিদায় নেয়া;
- লেখাপড়া বা পেশাগত কাজে অমনোযোগী হওয়া
- নিজের প্রতি অবহেলা করা, ইত্যাদি।

৫। বর্তমান সময়ে আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে কেন? বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রধান কারণ হিসেবে বলা হয়- মানসিক অবসাদ। আত্মহত্যার কারণ বিশ্লেষণকারীগণ নানাবিধ সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক কারণ তুলে ধরেছেন। এই লেখার শুরুতে উল্লেখ করা ভারতের কৃষকগণ আত্মহত্যা করেছিলেন অর্থনৈতিক কারণে যার সমাধান ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ। মানসিক অবসাদ মনস্তাত্ত্বিক কারণ হওয়ায় এর সমাধান কিছুটা সময়সাপেক্ষ কিন্তু সম্ভব। কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানীর মতে মানসিক অবসাদ সৃষ্টি হয়- প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলে, পরিবারের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ কমে গেলে, আত্মবিশ্বাস কমে গেলে, কোনো কারণে হতাশ হলে। আঁচল ফাউন্ডেশনের তথ্যমতে, শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার পেছনে সবচেয়ে বেশি দায়ী অভিমান। অভিমানের কারণে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী। আত্মহত্যার অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- সমাজের দ্রুত পরিবর্তন, সাইবার ক্রাইম, প্রেমবিচ্ছেদ বা সম্পর্কজনিত জটিলতা, প্রতারণার শিকার, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যবহার, পরিবার ও সমাজের অতি প্রত্যাশাজনিত মানসিক চাপ, পরীক্ষায় ভালো ফল না করার জন্য তিরস্কার, লেখাপড়াজনিত মানসিক চাপ, পরিবার ও সমাজের অন্যদের দ্বারা অপমানিত হওয়া, বুলিংয়ের শিকার, মাদকের ব্যবহার, পরিবার ও বন্ধুদের কাছ হতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা না পাওয়া, লজ্জা বা অপমানবোধ, অপরাধবোধ, জটিল ও দীর্ঘকালীন শারীরিক অসুস্থতা, দীর্ঘমেয়াদী মানসিক সমস্যায় ভোগা, ইত্যাদি। আমাদের যেসব পরিবার আত্মহত্যার কারণে তাদের অতি প্রিয়জন বা নিকটজনকে হারিয়েছেন তাদের প্রতি গভীর সমবেদনা রেখেই বলছি আপনারা যতটুকু জানেন ততটুকু বলে আত্মহত্যার কারণ বিশ্লেষণে সহায়তা করতে পারেন। গোপনীয়তা রক্ষা করেই আপনাদের দেয়া তথ্য সমাজের ভবিষৎ কল্যাণে ব্যবহার করা যাবে।

৬। গত তিন মাসের দু'টি দৈনিক পত্রিকা (সমকাল ও বাংলাদেশ প্রতিদিন) ঘেঁটে দেখেছি, ভালো ভালো ও নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেধাবী ও সম্ভাবনাময় ছাত্র-ছাত্রীরাও মানসিক অবসাদে ভুগতে ভুগতে এক পর্যায়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। আত্মহত্যাকারীদের পরিবারে আর্থিক সংকট ছিল, পারিবারিক কলহ ছিল। আত্মহত্যাকারীগণ পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত ফল করতে পারেন নি, বার বার ইন্টারভিউ দিয়েও চাকুরী পান নি, তাদের কেউ কেউ প্রেমে ব্যর্থ বা প্রতারিত হয়েছেন। সমাজ ও মনোবিশেষজ্ঞরা বলেছেন, শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যারোধে পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে একসাথে কাজ করতে হবে। প্রকৃতির সাথে শিক্ষার্থীর সম্পর্ক বাড়াতে হবে, শিক্ষার্থীর সম্পর্ক বাড়াতে হবে পরিবারের সদস্যদের সাথেও, সেসাথে দৃঢ় করতে হবে সামাজিক বন্ধন। শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এক সাথে কাজ করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দিতে হবে শিক্ষার্থী কাউন্সেলর যেন মানসিক সমস্যায় শিক্ষার্থীগণ যথাযথ পরামর্শ পেতে পারেন।

৭। এই লেখাটি লেখার সময় একটি ইংরেজী অনলাইন নিউজসার্ভিস, উকানে পড়লাম- ভারতের রাজধানী দিল্লী থেকে ৫০০ কিলোমিটার দক্ষিণের শহর কোটাতে বর্তমান বছরে ২৬ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করায় সেখানকার কাথলিক নেতৃবৃন্দ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ভারতের কাথলিক বিশপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি কমিশনের সেক্রেটারী ফাদার মারীয়া চার্লস বলেছেন- সহপাঠীদের অত্যধিক চাপ এবং পিতামাতা ও অভিভাবকদের অতিমাত্রার প্রত্যাশার ভার সহ্য না করতে পেরে পরীক্ষার্থীদের আত্মহত্যার মতো চরম পথ বেছে নেয়াটা খুবই দুঃখজনক। *(উকান, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩)*। এইসব আত্মহত্যাকারীগণ সকলেই ভারতের খ্যাতনামা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আইআইটি-তে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে অনুত্তীর্ণ হয়েছিলেন। স্কুল পর্যায় থেকে কাউন্সেলিং দেবার ওপর জোর দিয়ে ফাদার চার্লস আরো বলেন- শিক্ষার্থীদের মানসিক বৃদ্ধি ও বিকাশে আরো যত্ন নিতে হবে, তাদের জন্যে সুস্থ বিনোদনের সুযোগ বাড়াতে হবে, সর্বোপরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা-পরিবেশও উন্নত করতে হবে। ফাদার চার্লস- এর সাথে সহমত প্রকাশ করে আমি আরো কয়েকটি সুপারিশ রেখে এই লেখা শেষ করছি:

-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আত্মহত্যা প্রতিরোধবিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা যাতে গুরুত্ব দেয়া হবে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করা; সেসাথে মানসিক স্বাস্থ্যসেবার জন্যে কাউন্সেলিং দেবার জন্যে কাউন্সেলর নিয়োগ দেয়া।

-কোনোভাবেই আত্মহত্যাপ্রবণ ব্যক্তিকে তিরস্কার না করা; বরং তার প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে ও নমনীয় হয়ে সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবেলায় সহযোগিতা করা।

-কারো মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণ দেখলে তার প্রতি বেশি মনোযোগী হওয়া, বেশিক্ষণ পাশে থেকে খোলামেলা আলাপ করে মূল সমস্যার বিষয়ে জেনে তা সমাধানে প্রকৃত বন্ধুর মতো আচরণ করা।

-এই লেখার চতুর্থভাবে উল্লেখিত সংকেতগুলো পর্যবেক্ষণ করা, সতর্ক থাকা ও প্রয়োজনে সংকেতধারণকারী ব্যক্তির সাথে সরাসরি কথা বলে তার মনের অবস্থা জানা; অতপর তাকে এমনভাবে মোটিভেট করা যে, আলো ও আঁধারের মতো জীবনে উত্থান ও পতন, আশা ও হতাশা থাকবেই। কোনো এক বিষয়ে ব্যর্থ হওয়া মানে পুরো জীবন ব্যর্থ নয়। আঁধারের পর আলো আসেই। তেমনিভাবে, ব্যর্থতার পর সফলতা আসবেই।

সর্বোপরি শিশু, কিশোর, তরুণ ও যুবা এই প্রত্যেকটি পর্যায়ে ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ এবং নৈতিক শিক্ষায় নিরন্তর মানবিক গঠনদান; যথাযথ মানবিক গঠনদানই হতে পারে আত্মহত্যা প্রতিরোধের শ্রেষ্ঠ উপায়॥

পথশিশু

এরশাদ আল মামুন

ঢাকা শহরে ধানমন্ডি ১৫ নম্বর অভিজাত এলাকার মধ্যে অন্যতম। আর সেখানেই সংশ্লিষ্টদের নাকের ডগায় এই অবহেলিতদের জীবন যাত্রার ছবি। দেখে মনে হয় দায়িত্বের জায়গাগুলি যেন অন্ধ অথবা অলস।

এই শিশুরাই আগামীর ভবিষ্যৎ। তাই তাদের সঠিকভাবে পরিচর্যা করাটাও অত্যন্ত জরুরি। শিশু আর পথশিশু শব্দ দুটোকে আলাদা ভাবে দেখা মানবিকতা বিসর্জনের সামিল। শিশু ও পথশিশু কিন্তু একই জীবন যাত্রা হওয়ার কথা। এর কোনো ভেদাভেদ নেই। কিন্ত পার্থক্য শুধু এরা ফুটপাতে বা রেল ষ্টেশনের ধারেকাছে, আর এক শ্রেণি হলো অভিজাত বাসায় অভিজাত পরিবারের মাতৃকোলে। রাস্তায় জীবনযাপন করার কারণে তারা পরিচিতি পায় পথশিশু হিসেবে। পথশিশুদের বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই কচি, কোমলপ্রাণ মুখগুলো পরিচিত হয় নতুন অনেক অভিজ্ঞতার সঙ্গে। ওদের ভিতর কঠিন বাস্তবতা এমনভাবে জায়গা করে নেয় ফলে ওরাই একসময় হয়ে যায় নেশাখোর, ছিনতাইকারী, টোকাই অথবা ফুল বিক্রেতা।

এদের জন্মটা ঘটা করে পরিবারকে আনন্দ দেয় না। এদের বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নটা বাড়ে হয়তো, কিন্তু সে ভাবনায় কোথাও আকাশ কুসুম কল্পনা থাকে না। ওদের স্বপ্নই শুধু ভালোভাবে খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকা। সাধারণ শিশুরা যখন পরিবারের আদর নিয়ে স্কুলে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত থাকে ঠিক তখনি পথশিশুরা তার ফেরি করে নিয়ে বেড়ানো খাবার কিংবা খেলনা, ফুল কেউ কিনুক সেটি নিয়েই ব্যস্ত থাকে। ওদের স্বপ্ন থাকে পেটপুরে খাওয়া।

রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহরে হাজার হাজার পথশিশু রয়েছে। রাস্তাঘাট, রেলস্টেশন, বাস টার্মিনাল, অফিস চত্বর, পার্ক ও খোলা আকাশের নিচে তাদের বাস। বড় অসহায় তারা। শিশুদের মানসিক বিকাশ পাওয়ার জন্য যা যা দরকার এই পথশিশু গুলো সবকিছু থেকে বঞ্চিত। পায় না ভালো আচরণও। ওদের মাঝে খুব রুক্ষতা ফুটে উঠলেও আছে ভালোবাসা। সর্বনাশা মাদকে আসক্ত হয়ে পড়েছে হাজার হাজার পথশিশু। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের তথ্য মতে, পথশিশুদের ৮৫ ভাগই কোনো না কোনোভাবে মাদক সেবন করে। একটি শিশু কখনো পথ শিশু হয়ে জন্ম নেয় না। জন্মের সময় প্রতিটি শিশুই তার নাগরিক অধিকার নিয়েই জন্ম নেয়। আজ যে শিশু ভালোভাবে কথা বলতে শেখেনি তাকেও জীবিকার তাগিদে ভিক্ষা করতে হচ্ছে। তার কাছে জীবনের মানেই হলো ক্ষুধা নিবারণের জন্য পথে পথে ভিক্ষাবৃত্তি করে বেঁচে থাকার লড়াই।

ছিন্নমূল শিশুর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। বর্তমানে ছিন্নমূল শিশুর সংখ্যা ২০ লাখের মত হবে। এ সকল শিশুর বয়স সীমা ৩-১৮ বছর পর্যন্ত। এক জরিপের তথ্যে জানা গেছে, এসব শিশু অধিকাংশ এসেছে হত দরিদ্র এবং বাবা মায়ের বিচ্ছেদের কারণে ভেঙ্গে যাওয়া সংসার থেকে। এদের মধ্যে আবার কিছু শিশু আছে যারা সামান্য পরিমাণ অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন। পথে পথে অবহেলায় অনাদরে বেড়ে উঠা এ সকল শিশুর আশ্রায়হীনতা নিরাপত্তা হীনতা এবং রাত্রিকালীন কোন রকম সুরক্ষা ব্যবস্থা না থাকার কারণে এরা প্রতিনিয়ত ব্যাপক হারে যৌন নির্যাতন এ শোষণের শিকার হচ্ছে। কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের জন্য একটি কিশোর সংশোধন কেন্দ্র আছে কিন্তু পথকলি বা টোকাই শিশুদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকারী বা বেসরকারী তেমন কোন সংশোধন কেন্দ্র করার কার্যকরি উদ্যোগ নেই। যদি তেমন কোন কার্যকরী উদ্যোগ থাকত তা হলে দিন দিন এদের সংখ্যা হ্রাস পেত । এদের দূরাবস্থার জন্য দায়ী সমাজ ব্যবস্থা। দেশের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সুরক্ষা ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতি বছর পালিত হয় শিশু দিবস।

চিকিৎসকদের ভাষায়, শিশুরা মোটামুটি ৭ বছরের মধ্যে যা শেখে পরবর্তী জীবনে এ শিক্ষা বিরাট প্রভাব ফেলে। তাই এ সময়ে পথশিশুরা যদি লাঞ্ছিত হয়, অপমানিত হয়, কুশিক্ষা গ্রহণ করে, ছিনতাই, ভিক্ষা, সমাজের বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে পরিচিত হয় তাহলে সেটা তাদের জন্য এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বিরাট হুমকি হিসেবে দেখা দিতে পারে। যে সব শিশুর নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অভাব রয়েছে তারা অন্যায়ের দিকে পা বাড়ায়। শিশুদের নৈতিকতার শিক্ষা দিতে হবে। শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশের ওপর জাতীয় সমৃদ্ধি নির্ভরশীল।

আজকের শিশু যেহেতু আগামী দিনের কর্ণধার, তাই পথশিশুর অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। পথশিশুদের শৈশব কেড়ে নিয়ে তাদের অনিশ্চয়তায় ফেলে দেওয়া কখনও ঠিক হবে না। ওদেরও স্বপ্ন আছে, সেটা কারো কাছে লাঞ্ছিত না হওয়ার, ওদের চোখেমুখে শুধু দু'বেলা পেট ভরে খাবার আবেদন। কিন্তু এই আবেদনের প্রতি আমরা যদি একটু সাড়া দেই তাহলে পথশিশু পেতে পারে সুন্দর স্বাভাবিক জীবন। জীবন মানেই স্বাভাবিক ও সুন্দরের অধিকারী। আমরা প্রবাদ বাক্যে বলি 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।' আমরা মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে প্রকৃতির সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করি। তবে প্রকৃতির বাইরে সামাজিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ ও প্রদানের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বৈষম্য রয়েছে। সামাজিক বৈষম্যের শিকার এমন মানুষেরা একাকী পথে প্রান্তে ঝড়-বৃষ্টির মাঝে খেয়ে না খেয়ে রাত যাপন করে। পথশিশুদের উন্নয়নের ব্যাপারে শুধু সরকারি কার্যক্রম নয় সচেতনতার সঙ্গে সকলে মিলে কাজ করতে হবে॥

হে শিক্ষাগুরু

লিন্ডা রোজারিও

প্রাণের গুরু শিক্ষাগুরু তুমি,
তোমারই দেখানো পথে চলে শিক্ষার্থী
শিক্ষক হলেন জ্ঞানের ও সত্য পথের যাত্রী
তাদেরই অনুসরণ করে সকল শিক্ষার্থী।
মায়ের কাছ থেকে শুরু হয় শিশুর শিক্ষা
মায়ের পরে শিক্ষক হলেন
জ্ঞানের অন্য গুরু,
শিক্ষকরা ব্যস্ত থাকেন
জ্ঞান ছড়ানোর কাজে।
সমস্যার সমাধান পাই শিক্ষা গুরুর কাছে
অনুপ্রাণিত হই যে মোরা
তাদের শিক্ষা দেখে।
শিক্ষার্থীর সফলতায় ও বিফলতায় শিক্ষক
থাকেন পাশে,
তিনি যে শুধু জ্ঞান দান করেন তা তো নয়
নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষা পাই
তাদের কাছ থেকে
তাদের মতো মহান মানুষ নেই
কোন শিক্ষাকূলে ।
শিক্ষক দিবসে তাদের কথা স্মরণ করে
জানাই মোরা শ্রদ্ধাঞ্জলি॥

প্রিয় শিক্ষিকা

যোহন রায়

পিতা-মাতা না হয়েও তুমি তাদেরই সমান।
তোমার তরে মোর বিনম্র শ্রদ্ধা
আজ করিগো প্রদান।
জীবনে তোমার শিক্ষা করিগো স্মরণ
মাতৃস্নেহে আমারে ভালোবাসতে সর্বক্ষণ।
অসুস্থতায় না দেখলে স্কুলে নিয়েছো
তুমি খোঁজ,
ভাল-মন্দ জিজ্ঞাসিতে করনি সংকোচ।
শব্দ বাক্য শিখিয়েছো হাতে ধরে ধরে
তোমার সব স্নেহের শাসন আজও
মনে পড়ে।
ভুল করলেও সামনে দাঁড়াতে
দিতে গো অভয়
সমাধান দিয়ে সবার মন করতে জয়।
গুরুজনদের সম্মান করতে শেখাতে
সদা তুমি
শুনিয়েছিলে গল্প এক ছেলের নাম
বায়োজিদ বোস্তামি।
আজও তোমার কোন আদর্শ পারিনি
গো ভুলতে
আশীর্বাদ কর আদর্শ জীবন পারি
যেন গড়তে॥

যুক্তির ফাঁদে

ক্ষুদীরাম দাস

ফরিশীরা যিশুকে যুক্তির ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিলো। কেননা যিশু মন্দিরে শিক্ষা দিয়েছেন দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এবং এর মধ্য দিয়ে ঐসব দুষ্ট ফরিশীদের দুষ্টতাকে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। এতে ফরিশীরা রেগে যায় ও পরামর্শ করে; কীভাবে তাঁকে ফাঁদে ফেলবে যাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারে। তারা এক ফন্দি করে ও তাঁরা ভুল ধরতে পারে সেজন্যে সুযোগ বের করে যিশুকে প্রশ্ন করে, 'গুরু, এই ব্যক্তিরা বলে, 'আমরা জানি, আপনি সত্য, এবং সত্যরূপে ঈশ্বরের পথের বিষয় শিক্ষা দিতেছেন, এবং আপনি কাহারও বিষয়ে ভীত নহেন, কেননা আপনি মনুষ্যের মুখাপেক্ষা করেন না। ভালো, আমাদিগকে বলুন, আপনার মত কি? কৈসরকে কর দেয়া বিধেয় কি না?'

যিশু তাদের এই দুষ্ট চাটুবাদে বোকা বনে যাননি। তিনি জানেন যদি বলেন, 'না, কর দেওয়া ঠিক বা বিধেয় নয়,' তাহলে তাঁকে রোমীয়দের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী রূপে দোষী করা হবে। আর, যদি বলেন, 'হ্যাঁ, কর দেয়া বিধেয়,' যিহূদীরা যারা রোমীয়দের পরাধীনতা ঘৃণা করে, তারা তাঁকে ঘৃণা করবে। তিনি উত্তর দেন, 'কপটীরা, আমার পরীক্ষা কেন করিতেছ? সেই করের মুদ্রা আমাকে দেখাও।' যখন তারা একটি মুদ্রা তাঁর কাছে নিয়ে আসে, তিনি প্রশ্ন করেন, 'এই মূর্তি ও এই নাম কাহার?' 'কৈসরের', তারা উত্তর দেয়।' যিশু বলেন, 'কসরের যাহা যাহা, কৈসরকে দেও, আর ঈশ্বরের যাহা যাহা, ঈশ্বরকে দেও।' এই ব্যক্তিরা, যখন যিশুর এই কর্তৃত্বব্যঞ্জক উত্তর শুনলো, তারা আশ্চর্য জ্ঞান করলো এবং দ্রুত সেখান থেকে চলে গেলো। তারা যিশুকে যুক্তিতে পরাজিত করতে চেয়েছিলো।

যুক্তি ভালো, তবে এমন যুক্তি তৈরি করা ঠিক নয়; যা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে, যা সত্যকে দাবিয়ে রেখে মিথ্যেরা দাপিয়ে বেড়ায়, জয়োল্লাস করে। এমন যুক্তির কী মূল্য থ াকতে পারে। হয়তো দৃশ্যত যুক্তিতে সবই পরিষ্কার মনে হয়, কিন্তু অন্তরালে ছলনাকে উপস্থাপন করে পাপের রাজত্ব বিস্তার করা কোনোভাবেই ভালো বিষয় নয়। আমরা অনেক সময় যুক্তিতে এতোটাই পারদর্শী হই যে, ঈশ্বরের বাক্যকেও যুক্তির ফাঁদে ব্যবহার করি। অন্তত নিজেরা যেন স্বার্থ উদ্ধার করতে পারি। একটি উদাহরণ দিচ্ছি : একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি প্রতিবেশীর হাতে খাবার দেখে বললো, 'প্রতিবেশীকে আপনার মতো প্রেম কর।' একথাটি বললো, যেন তাকে খাবার দেয়। অপরদিকে সেই প্রতিবেশি শুনিয়ে শুনিয়ে বললো, 'প্রতিবেশীর বস্তুতে লোভ করিও না।' অনেক সময় আমরা আমাদের প্রয়োজনে এভাবেই ঈশ্বরের বাক্যকে ব্যবহার করতে দ্বিধা করি না।

আমরা প্রতিটি মানুষ যুক্তি নির্ভর! যুক্তি ছাড়া কেউ চলতে পারি না। যুক্তি ছাড়া সত্যের উদ্‌ঘাটন হয় না। যুক্তি ছাড়া মিথ্যেকে দূরে ঠেলে দেয়া যায় না। কেননা আমরা যুক্তিতে চলি, যুক্তিতেই বলি। সুতরাং যুক্তির মূল্য আছে। যেখানে যুক্তি নেই, সেখানে বোকামীর পরিচয় রয়েছে। আবার যুক্তিতেই সত্যকে দাবিয়ে রাখা যায়। তখন মিথ্যেরাও উল্লাস করে। একজন নির্দোষীকেও যুক্তির ফাঁদে ফেলা যায়। তাহলে যুক্তিরই বা কী মূল্য থাকে? আবার সব যুক্তি গ্রহণযোগ্য হয় না। কেননা সেই যুক্তিও যদি নিজের কাছে পজিটিভ না হয়, তাহলে তা কিভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? অথচ আমরা যুক্তিকে গ্রহণ করি নিরুপায় হয়ে। আবার কখনো কখনো মানুষের জীবনে এমন যুক্তি চলে আসে যে, তখন কী করবো বুঝতেই পারি না। মনে হয়, যে যেটা যুক্তি দিয়ে বলছে সেটাই সঠিক! কিন্তু আদতে সেটা সঠিকই নয়। তখন মনে মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, ছন্দ সৃষ্টি হয় না। সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠা পায় না, তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় বৈকি! যেমন-অনেকদিন আগে আমি একটি গল্প পড়েছিলাম, অথবা কারো মুখ থেকে শুনেছিলাম। গল্পটি এ রকম- একদিন বাবা ও ছেলে বিশেষ প্রয়োজনে বাড়ির পোষা গাধাটিকে বিক্রি করার জন্যে হাটের পথে যাত্রা শুরু করলো। বাবা, ছেলে ও গাধা তিনজনই হেঁটে যাচ্ছে। কিছুদূর যাওয়ার পর একজন লোক তাদের দেখে বললো, এরা কত বোকা! গাধা থাকতে হেঁটে যাচ্ছে। একজন তো গাধার পিঠে উঠে আরাম করে যেতে পারে। লোকটি কথাটি বলে হন হন করে হেঁটে চলে গেলো। তখন লোকটির কথায় যুক্তি আছে মনে করে, বাবা তার ছেলেকে গাধার পিঠে উঠিয়ে দিলেন। চিন্তা করলেন এখন আর হয়তো কেউ কিছু বলবে না। এটাই যথেষ্ট। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর ছেলে গাধার পিঠে আর বাবা হেঁটে চলেছেন। এই দৃশ্য দেখে একজন বললো, কী অভদ্র যুবক ছেলে! নিজে গাধার পিঠে চড়ে যাচ্ছে; আর বুড়ো বাপকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এটা কী ঠিক হলো? বাবার যে কষ্ট হচ্ছে, এটা এই যুবক ছেলেটি বুঝতে পারে না? বাবা ও যুবক ছেলে চিন্তা করলো, লোকটির কথায় তো যুক্তি আছে। এটা তো আমরা ঠিক করছি না! এ মন্তব্য শোনার পর বাবা ও ছেলে স্থান পরিবর্তন করলো। এবার বাবা গাধার পিঠে উঠলো আর ছেলে হেঁটে চললো। আর মনে মনে চিন্তা করলো, এইবার হয়তো যথার্থ হয়েছে। কিন্তু আরো কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর আর এক ব্যক্তি মন্তব্য করলো, কী নিষ্ঠুর পিতা! নিজে গাধার পিঠে উঠছে, আর মাসুম বাচ্চাটিকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এমন বাবাও পৃথিবীতে আছে তাহলে! কী নিষ্ঠুর বাবা, মনে দয়ামায়া বলে কিছু নেই। এ মন্তব্য শোনার পর বাবা ও ছেলে চিন্তা করলো, লোকটির কথায় তো যুক্তি আছে। এটা তো ঠিক করছি না আমরা। এবার দু'জনই গাধার পিঠে উঠলো। গাধা চলতে শুরু করলো। এবার কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তাদের দেখে আর একজন আক্ষেপ করে বললো, কী অত্যাচার! কী অবিচার! কী নিষ্ঠুর! একটি অসহায় বোবা গাধার উপর দু'জন ভারী মানুষ উঠে বসলো। এটা কী ঠিক হলো? একটি গাধা তার উপর দুটি লোক!

এবার বাবা ও ছেলে পড়লো মহাসমস্যায়। কী মুশকিল! গাধার সাথে হেঁটে গেলে দোষ! ছেলে উঠলে দোষ! বাবা উঠলে দোষ! দু'জন উঠলেও দোষ! এখন কী করা যায়? বাবা ও ছেলে মিলে নতুন বুদ্ধি বের করলো। তারা বাঁশ ও রশি যোগাড় করলো। তারপর সেই রশি দিয়ে গাধার চার পা বাঁধলো। তারপর পায়ের ফাঁক দিয়ে বাঁশ ঢুকিয়ে দিলো। বাবা সামনে আর ছেলে পিছনে, বাঁশ কাঁধে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলো। গাধা রইলো ঝুলে। কিছুদূর যাওয়ার পর মানুষজন তা' দেখে হাসতে লাগলো। এরপর গাধাকে কাঁধে নিয়ে সাঁকো পার হওয়ার সময় গাধা ভয় পেয়ে নড়ে উঠলো। বাবা, ছেলে ও গাধা পড়ে গেলো খালে। গাধার মেরুদণ্ড ভাঙলো। বাবা ও ছেলের ভাঙলো পা। গাধা আর বেঁচা হলো না। বাবা ও ছেলে আহত অবস্থায় বাড়ি ফিরে এলো।

এ গল্প থেকে আমরা কী বুঝলাম! গল্পের মাধ্যমে আমরা অনেক শিক্ষাগ্রহণ করতে পারি। আমরা আমাদের পরিকল্পনা মোতাবেক, স্বাভাবিকভাবে কাজ করি। তখন কেউ যদি তার মতো করে আমাদের সামনে যুক্তি দাঁড় করিয়ে তার মতো করে আমাদের চালাতে চায়, তখন তাদের কথা

আমাদের শোনা উচিত নয়। হয়তো তার যুক্তি ঠিক, তবুও তার মতো করে চলতে গেলে আমরা লক্ষ্যচুত হতে পারি। সুতরাং সে বিষয়টি চিন্তা করে নিজের মতো করেই আমাদের চলা উচিত। সবার যুক্তি শোনা ও পালন করা মানে, আমরা তাদের যুক্তির ফাঁদে পা ফেলি। তাছাড়া বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে আমাদের সামনে যুক্তি দেখাতে পারে। সবার যুক্তি শুনতে গেলে আমাদের ক্ষতিরই সম্ভাবনা বেশি। সেই সাথে অস্থিরতাও কাজ করবে; অর্থাৎ কী করতে হবে সেটা আমরা বুঝতেই পারবো না। সবার কথামতো চলতে গেলে নিজের সঠিক গন্তব্যও হারিয়ে ফেলবো। আমাদের সমাজের উঠতি বয়সীরা কুযুক্তির ফাঁদে পড়ে পথ হারায়; আর নিজেদের ধ্বংস নিজেরা ডেকে আনে। এজন্যে আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত যুক্তিবোধ শাণিত করা। কেননা আমাদের মনে রাখা উচিত যে, যুক্তির ফাঁদে আটকা পড়লে মুক্তি কি মেলে সহজে? শ্বাস নেয়া যায় প্রাণখুলে? মোটেও না। কোথাও যেন একটুও স্বস্তির দেখা নেই। সমাজে দুষ্টলোকের অভাব নেই। আমার, আপনার, আমাদের চারিদিকে দুষ্টলোক ছড়িয়ে আছে। সময়ের ফাঁদ অন্যরকম। জীবনের একপর্যায়ে সবাই এখানে আটকে যায়। মুহূর্তের নির্দিষ্ট কিছু হিসেব চুকিয়ে দিলেই মুক্তি। তবে যুক্তির ফাঁদ সেভাবে কাজ করে না। প্রকৃতপক্ষে, যুক্তির মারপ্যাঁচে গাঁথা হয় যে ফাঁদ, সেখান থেকে মুক্তির জন্যে চাই পাল্টা যুক্তি। প্রতি আক্রমণ না করে হার মানলেই সমস্যা। আক্রমণকারীর যুক্তির পাল্লা আরো বেশি ভারি হয়ে ওঠে তখন। সত্যিই, এ এক ভয়ঙ্কর যুক্তির দুষ্টখেলা। ফাঁদ কেটে ফাঁদ তৈরির দুর্দান্ত এই খেলার শেষ কোথায় হতে পারে! ফাঁদ, ভুক্তভোগীকে বিপদে ফেলার চমকপ্রদ এক কৌশল। যুক্তির কারুকাজে আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করে সেটা। যার পরতে পরতে কঠিন যুক্তির মারপ্যাঁচ। ফাঁদ তৈরির কাজটাও সত্যিই সত্যিই যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্যে কুটকৌশল তৈরি করে দুষ্টলোকেরা। অনেক সময় যুক্তিতে সত্য উদ্‌ঘাটন হলেও যুক্তির ফাঁদে বন্দী থাকে যা' সত্য; আর সেটা হয়তো চিরদিনের জন্যে! এমন ঘটনার অভাব নেই। যুক্তিতে হয়তো জীবনের কোনো এক সময় অনেক কিছু গ্রহণ করি; কিন্তু দীর্ঘদিন পর মনে হয় সেটা সঠিক ছিলো না। অর্থাৎ আমরা যুক্তির ফাঁদে পড়ি বলেই মিথ্যাকে ধরে রেখে জীবন পাড় করি। তবে যুক্তিতে পরিস্থিতির ফাঁদে পড়লে মানুষ কীভাবে আমূল পাল্টে যেতে পারে সেটাও ভাবা দরকার; দুর্বলরা এখানেই নীরব। শয়তানের ধোঁকা আর ভালো কাজের মধ্যে পার্থক্য খুব সূক্ষ্ম। উভয়টির মধ্যে ভেদ এতোই অস্পষ্ট যে, নিগূঢ় চিন্তাভাবনা ও ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া তা' বুঝতে পারা অসম্ভব! দুষ্টলোক অন্যায় করলো, ক্ষমা চাইলো; আবার অন্যায় করলো, ক্ষমা চাইলো; এভাবে বার বার একই কাজ করলো। এখানে কথা হলো, এই ব্যক্তির কি এখন আবার ক্ষমা চাওয়ায় লজ্জা পাওয়া উচিত নয়? বার বার অবাধ্য হয়ে বার বার ক্ষমা চাওয়া! আসলেই দুষ্টলোক বা শয়তানের খেলটা এখানেই। ক্ষমা চাওয়ার সুন্দর যুক্তির ফাঁদে ফেলে মানুষকে বিপদে ফেলার নতুন কৌশল!

একটা কথা সত্যি যে, শব্দ মানুষের সৃষ্টি। এ নিয়ে কোনো ধোঁয়াশা নেই। কিন্তু প্রাণ না থাকলেও শব্দের অর্থ আছে। তা' নিয়েই শব্দগুলোর জীবন কাটে। তবে সেই অর্থ নিয়েই যদি ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়, তবে কতিপয় শব্দের আত্মবিশ্বাস কমে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। ফলে সাধারণ মানুষের বোঝার যেমন ঘাটতি হতে পারে, তেমনি শব্দটি নিজেও বিভ্রান্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। কী অদ্ভুত! যুক্তির ফাঁদ কতোই না ভয়াবহ।

আমি ঝামেলা এড়িয়ে চলা মানুষ! তাই জীবনে হেরেছিও অনেক। এখনো আমি চেষ্টা করি পারতপক্ষে ঝামেলায় না জড়াতে। ঘটনাটি আমার কোনো এক কর্মস্থলের। আমার দুই সহকর্মী ছিলো মারাত্মক তর্কবাজ। কথায় কথায় তারা তর্ক শুরু করে দিতো। মনে করুন দুই বন্ধুর একজন 'ক', অন্যজন 'খ'। 'খ' যদি বলে এটা এভাবে করতে হবে, 'ক' কথা শেষ না হতেই বলে এটা এভাবে করার কোনো মানে নেই। আর শুরু হলো তাদের মধ্যে তর্কাতর্কি। কিন্তু আমার এসব তর্কাতর্কি ভালোই লাগতো না। আমার পছন্দ নির্ঝঞ্ঝাট জীবন। অবশ্য এরপর অনেকদিন পর তাদের সাথে একত্রিত হওয়ার সুযোগ হয়েছিলো। সেখানে দেখলাম ওই দুই তার্কিক বন্ধুর মধ্যে এখন আর কোনো যুক্তিতর্কের ঝগড়া নেই। ব্যাপারটা আমার কাছে খটকার মতো লাগলো। আমি তো হতবাক! তুখোড় তার্কিক দুই সহকর্মী কীভাবে তর্ক ছাড়া দুই ঘন্টা বসে রইলো বিষয়টা জানার খুব ইচ্ছা। অনেকটা খোঁচা দেয়ার উদ্দেশেই বললাম, আচ্ছা 'ক'! 'খ' এর সাথে কীভাবে আপনাদের মিল হলো। আমাকে অবাক করে দিয়ে বন্ধু বললো, এটাও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী অবশ্যই ঠিক আছে। উত্তরটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিলো আমাকে। আমাকে আবার বললো, আসলে যে যাই করে সেটা তার দৃষ্টিভঙ্গি ও জ্ঞানের ফল। আমি বিষয়টা আমার দৃষ্টিভঙ্গি ও জ্ঞানের আলোকে একরকম ভাবছি, অন্যজন অন্যভাবে ভাবছে। দুনিয়ার সবাইকে যে আমার মতো ভাবতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই। সত্যিই আমরা তর্ক করি কিন্তু মনে শান্তি পাই না। কারণ, আমরা যেতার জন্যেই যুক্তিতর্ক করি।

'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ,
যুক্তি যেখানে আড়ষ্ট,
আর মুক্তি সেখানে অসম্ভব।'

অতএব, কিছু দুষ্টলোক অভিনয় করে যেতে থাকে; কিন্তু একদিন মঞ্চ ভেঙে পড়ে। যুক্তি আর বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য হলো, যুক্তির মধ্যে ভুল থাকতে পারে। মানুষ যখন কোন কিছুকে না দেখেই তার ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত দেয়ার চেষ্টা করে তখন তাকে সেই বিষয়টা নিয়ে তার অভিজ্ঞতার আলোকে চিন্তা করতে হয়। আর এই চিন্তা করার সময়ই মানুষ অনেক কিছু স্মরণ করতে পারে না।আর স্মরণ করতে না পারার কারণেই তার যৌক্তিক চিন্তাও ভুল ফলাফল নিয়ে আসে। আসলে 'বিশ্বাসে মেলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর'- বিশ্বাস করে নেয়াটা যতো সহজ কাজ, যুক্তি খুঁজতে যাওয়া ততোই কঠিন। যুক্তি খুঁজতে যথেষ্ট মানসিক পরিশ্রম দরকার, তাঁরচেয়েও বড় যেটা এমন আশঙ্কা থেকে যায় যে, যুক্তির সাহায্যে যদি বিশ্বাস খণ্ডন হয়ে যায় তখন নিজের মূল্যবোধ, দর্শন সবকিছুই আবার নতুন করে গড়তে হতে পারে। এই ঝুঁকি নিতে হলে কঠিন মানসিকতা থাকা দরকার। বুদ্ধিমত্তার বিচারে অধিকাংশ মানুষই অলস প্রকৃতির; দরকারের চাইতে বেশি মাথা ঘামাতে চায় না। সেখানে বিশ্বাসের জোরই বেশি, যুক্তির কম। বিশ্বাসের কাছে প্রায়ই তার হার হয়। তবে আশার ব্যাপার এটাই, হার হলেও যুক্তি হার মানে না কখনোই। তবে বাস্তবতা সঠিক যুক্তি দ্বারা নির্মিত। কিন্তু কথা হচ্ছে গিয়ে এই সঠিক যুক্তি কথাটি বেশ বিতর্কিত। বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে যুক্তি বদলে যেতেই পারে। কিন্তু বাস্তবতা অপরিবর্তিত থাকে।

অবশ্য এটাও ঠিক যে, লজিক ছাড়া কিছু শুদ্ধ হয় না। আর যুক্তি তখনই সুন্দর ও সার্থক হবে, যখন সেখানে জ্ঞান থাকবে। আর জ্ঞানের পূর্বশর্ত হলো শিক্ষার্জন করা ও পবিত্র শাস্ত্র বাইবেল জানা। সেদিন আর বেশি দিন দূরে নয়, যেদিন বাংলাদেশে সুন্দর উপস্থাপনের চেয়ে জ্ঞান ও অধিক যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যই অধিক গুরুত্ব পাবে। আশা করি, বর্তমান সময়ের বিতার্কিক সেদিকে এগিয়ে যাবে। কারণ, এখন বাংলাদেশে সুন্দর করে কথা বলা লোকের সংখ্যার অভাব নেই, যারা যুক্তির ফাঁদে ফেলতে পারে; কিন্তু সুন্দর করে চিন্তা করা, জ্ঞানী ও সব বিষয়ে জানাশোনা লোকের সংখ্যা খুবই কম। অতএব, সাবধান!

মাছ ধরা

মিল্টন রোজারিও

– ওই কুদ্দুইস্যা, শিগ্‌গির কোলাডা নিয়্যা আয়, বড় একটা বেম মাছ দরছি।
- কোলা পাই নাই, খালই নিয়্যা আইছি।
- ঠিক আছে। তুই অহনে শিগ্‌গির বাইত্তে যা, উঁচাডা নিয়্যা আয়। ইচা মাছ মাইর‍্যা নিয়্যা আয়, আমার আদার শেষ অইয়্যা গেছে। এহিনে অনেক মাছ আছে রে। শিগ্‌গির।
- উঁচা কুথায়?
- উঁচা বাইরে ডেহির গরে মাচার উপরে আছে। যা, শিগ্‌গির যা কুদ্দুইস্যা।
- হ। আমি অহনেই যাইব্যার নইছি।

কুদ্দুস আর পলু সমবয়সি দশ/বারো বয়সের বালক। কুদ্দুসের মা পলুদের বাড়ীতে অনেক বছর ধরে কাজ করছে। উরুম ভাজা, কাপড় ধোয়া, দুয়্যার, ঢেকির ঘর, চুলার পাড় ন্যাপা হচ্ছে তার প্রধান কাজ। আশে পাশের গ্রামেও আমাদের সব বাড়ীতে কুদ্দসের মা, হুসেনের মা, তাহেরের মা, কদমের মা, বদুর মা এরা সবাই এমনি কাজ করে থাকে। ভাদ্র মাসের পরে অর্থাৎ বড়দিনের আগে গ্রামের প্রতিটি বাড়ীতেই ঝাড়পোছ করে রাখা হয়। উরুম ভাজা, মাটির ঘর ল্যাপাপোছা করে রাখা হয়। কারণ, বড়দিনের আগে তখন সবাই পিঠা বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ঐ সময় আর ঘর ঝাড় দেয়া বা ঘরবাড়ী ল্যাপাপোছার সময় হয়ে ওঠে না।

কুদ্দুস দৌড়ে বাড়ীতে যায় উঁচা আনতে। দাদীকে গিয়ে বলে,

- ও বু, বু লো, পলুদা শিগ্‌গির উঁচা দিব্যার কইছে। এ্যাতো বড় একটা বেম মাছ দরছে। শিগগির উঁচাডা দেও। পলুদার আদার শেষ অইয়্যা গেছে। পলুর ঠাকুরমা তখন রান্না ঘরে বসে মিষ্টি কুমড়া কাটছিল। কুদ্দুসের চিৎকার শুনে বলে,
- উইযে দেখ, ডেহির ঘরে মাচার উপরে আছে উঁচা। নিয়্যা যা। দেহিচ মাচার উপরে অনেক মাইট কোলা আছে। ভাঙ্গে না যেমুন।

কুদ্দুস দাদীর কথা মত ডেহির ঘরে যায়। উঁচা নিয়ে দৌড়ে পলুর কাছে যায়। গিয়ে বলে,

- পলুদা এই যে উঁচা নিয়্যা আইছি।
- তুই শিগ্‌গির কয়ডা ইচা মাছ দইর‍্যা নিয়্যা আয়।
- আইচ্ছা। যাইব্যার নইছি।

কুদ্দুস উঁচা দিয়ে ইচা মাছ ধরতে গিয়ে পিছল্যা খেয়ে নদীতে পড়ে যায়। এতে উঁচা নদীতে ভেসে যায়। পলু কুদ্দুসের এই কারবার দেখে ক্ষেপে যায়।

- শালা কুদ্দুইস্যা। দিলিতো আমার মাছগুনি সব খেদিয়্যা। আয় তুই। টানে আয়। বড়শির ছিপ দিয়্যা তরে বাইড়িয়্যা ফাটিয়্যা ফালামু।

আশেপাশে আরো যারা বড়শিতে মাছ ধরছিল তারাও কুদ্দুসকে বকতে থাকে। ছলু বলে, ও একটা হাম্বট। ন্যাবড়া শালা। টনি বলে, ওই ছলু হাম্বট কিরে?

- হাম্বট তুই বুঝবি ন্যা।
- বুঝুম না ক্যান?

ছলু রেগে যায়। বলে, এত কতা কছ ক্যা? এমতেই মাছ দরে না। তার মদ্যে হাম্বট কুদ্দুইস্যা দিল সব মাছ খেদিয়্যা। মেজাজ খারাপ আছে অহনে। চুপচাপ মাছ দর। নাইলে বাইত্তে যা।

কুদ্দুস কোন ভাবে সাঁতরিয়ে পাড়ে উঠে আসে। উঁচাটা নদীর স্রোতে ভাসতে ভাসতে অনেক দূরে চলে যায়। সুনীল কাকা তার কোষা নৌকায় বসে ভাড়ার বড়শিতে বাইল্যা মাছ ধরছিল। পলু সুনীল কাকাকে বলে, সুনীল কাকা আমার উঁচাডা ইট্টু আইন্যা দেও না। ঐ শালা কুদ্দুইস্যা দেহ আমার উঁচাডা গাঙ্গে ফালিয়্যা দিছে। অগ্যতা সুনীল পলুর উঁচাটা এনে দেয়। পলু রাগের চোটে গজগজ করতে করতে বাড়ীতে চলে যায়। বাড়ীতে গিয়ে কুদ্দুসের মাকে বলে,

- দ্যাহ কুদ্দুসের মা, তুমার পুলায় আমার উঁচাডা গাঙ্গে ফালিয়্যা দিছিলো। আমরা বইয়্যা বইয়্যা সুন্দর মাছ দরবার নইছিল্যাম। তুমার পুলায় উঁচা নিয়্যা গাঙ্গে পইর‍্যা গিয়্যা সব মাছ খেদিয়্যা দিছে। ওরে অহনে পাইলে বড়শির ছিপ দিয়্যা পিট্যামু।

রান্না ঘর থেকে পলুর মা বলে,

- পলু খুব অইছে মাছ দরা। অহনে যাও ভালো মতন হাতমুখ ধুইয়্যা ঘরে যাও। আর মাছ মারনের দরকার নাই।

পলুর ঠাকুরমা বলে, কেমুন পুলা তুমার কুদ্দুসের মা। এত শয়তান ক্যা। নাতির নগে মাছ মারবার গেছদ, ঐহিনে গিয়্যা বান্দ্রামির কি দরকার। তুই বইয়্যা বইয়্যা মাছ দরা দেখ।

পলুর মা বলে, থাক মা। তুমি আর নাতিরে আস্কাড়া দিও না। দুইজনেই সমান। দেইকো ইট্টু পরেই আবার দুইজনে এক নগে বইয়্যা খেলাইবোনে। ঢেঁকির ঘরের পিছনে কুদ্দুস ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। কুদ্দুসের মা ছেলেকে ধরে এনে পাছায় দুই থাপ্পর দিয়ে বলে,

- শয়তান পুলা। আর শয়তানি করবি? কাইলক্যা থেইক্যা তরে আর কুন বাইত্তে নিয়্যা যামু ন্যা। বাইত্তে একলা থাকপি।

পলুর মা বলে, থাক কুদ্দুসের মা। ওরে আর মাইরো না। কাটার মদ্যে ওরে ইট্টু উরুম দেও বইয়্যা বইয়্যা খাইক। ঘরে হুগন্যা মিটি আছে। খারও আমি নিয়্যাহি। ঐদিনের মত পলুর বড়শিতে মাছ ধরা শেষ। বিকেলে ন্যাহাজ ডাক্তরের গাঙ্গে নৌকা বাইচ। টেডির নৌকা ভাড়া করা হয়েছে। সবাই মিলে নৌকা বাইচ দেখতে যাবে। পলুর মা বলে, বিয়্যালে আমরা সবতে নৌকা বাইচ দেখবার যামু। তুমি ও যাইও কুদ্দুসরে নিয়্যা আমাগো নগে।

- না বৌদি। তুমরা যাও। আর দুই খুলা উরুম অইবো, বাইজ্যা বাইত্তে যামু। কুদ্দুসের বাপে আছে বাইত্তে। তার নগে আমরা ন্যাহাজ ডাকতরের বাইচ দেখপার যামু। আর বৌদি, হুন পুলাডা ঠিক ওর বাপের মতন এট্টু ন্যাবড়া। হুগন্যা দুয়্যারেও আছাড় খায়। এই কথা বলে ওরা হাসতে থাকে॥

নিয়মিত কলাম

সেদিনের গল্পকথা

হিউবার্ট অরুণ রোজারিও

আমাদের গর্বিত পতাকা

বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকা সকল বাঙালির গর্বের বিষয়। পতাকায় রয়েছে এক সুন্দর দেশপ্রেমের কাহিনী। সেটা বাঙালির মুক্তির কাহিনী, স্বাধীনতার কাহিনী। প্রারম্ভে সবুজের উপর লাল এবং উপরে দেশের মানচিত্র ছিল। পতাকাটি যখন ডিজাইন করা হয়েছিল-সে সময় স্বাধীনতার সংগ্রামে আমরা যুদ্ধে। তখন পতাকার মাপ, রঙের ব্যাপারে খুব একটা পরিকল্পনা ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের সময় এ পতাকাটি আমাদের খুবই অনুপ্রাণিত করতে পেরেছে। শত্রুসেনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মনোবল যুগিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের পর পরই সেই পতাকাটিতে শুদ্ধভাবে উন্নত করা হয়। সবুজের উপর শুধু লাল সূর্যটি রাখা হয়। পতাকার মাপ ও রং ঠিক করা হয়।

রাষ্ট্রের সব অনুষ্ঠানে, স্কুলে পতাকাটি যথাযথ মর্যাদায় উত্তোলন করা হয়ে থাকে। পতাকা দেশের প্রতীক এবং এর একটা বিশেষ মহত্ব রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ভুল মাপের পতাকা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সে বিষয়ে আমাদের সবার সচেতন থাকা উচিত। অনেক সময় রাস্তায় জাতীয় পতাকাটি একেক ধরনের রঙে বানানো হয়। আবার পতাকার বৃত্তটা কতখানি হবে, রেখাগুলো কোন দিকে হবে সেগুলোতেও ভুল দেখা যায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরের বছরই জাতীয় পতাকা বিধিমালা ১৯৭২ জারি করা হয়েছে। ২০১০ খ্রিস্টাব্দে সেটি সংশোধিত করা হয়েছে। বিধিমালার ৩নং ধারায় পতাকার আয়তন ও বর্ণনায় সব বিস্তারিত লেখা রয়েছে। "আমাদের জাতীয় পতাকাটি গাঢ় সবুজ রঙের হইবে এবং ১০.৬ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের আয়তক্ষেত্রাকার সবুজ রঙের মাঝখানে একটি লাল বৃত্ত থাকিবে।" লালবৃত্তটি পতাকার দৈর্ঘের এক পঞ্চমাংশ ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট হইবে। পতাকার নয়বিংশতিতম অংশ অঙ্কিত অনুভূমিক রেখার পরস্পর ছেদ বিন্দুতে বৃত্তের কেন্দ্র সবুজ এবং বিন্দু হইবে ব্রিলিয়ান্ট গ্রীন সাথে লাল বৃত্তাকার অংশ হইবে ব্রিলিয়ান্ট লাল।

সাধারণ মানুষের পক্ষে পতাকার যথাযথ সঠিক সমীকরণ করা বেশ কঠিন। এই প্রযুক্তির যুগে সব ডিজাইনের কাজ কম্পিউটারে করা হয়। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অনেক প্রকাশনায় বাংলাদেশের পতাকা ছাপাতে হয়। জাতীয় পতাকাটি ঠিকভাবে তৈরি করার বিষয়টি স্কুল পর্যায়েই শেখানো উচিত। শৈশবে শেখানো হলে সেটা সারা জীবন মনে থাকবে। যারা পতাকা তৈরি করে থাকেন তাদের খুবই সচেতন থাকা প্রয়োজন। বর্তমান প্রযুক্তির সঙ্গে মিলিয়ে নতুন বিধিমালা নতুনভাবে হালনাগাদ করা গেলে পতাকা তৈরীর ক্ষেত্রে ভুল হওয়ার ঝুঁকি অবশ্যই কমে যাবে। জয় বাংলা পতাকা।

প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধার কাছে পতাকাটি অনেক আবেগের বিষয়। সব জাতীয় দিবসের আগে পতাকার সঠিক মাপ ও রং সম্পর্কে সকলকে জানানো হয়। সাধারণ মানুষ যখন সচেতন হতে পারবে তখনই শহীদদের আমরা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারব সঠিকভাবে॥

৩৪তম জপমালা রাণী মা মারীয়ার তীর্থোৎসব- ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

মূলভাব: "পবিত্র পরিবার ও খ্রিস্টীয় সমাজ গঠনে পুণ্যময়ী মারীয়া"

তীর্থস্থান: হরিণছড়া চা বাগান। শ্রমিক সাধু যোসেফের ধর্মপল্লী, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

সম্মানিত বিশ্বাসী তীর্থযাত্রীগণ,

অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আসছে আগামী ২৮-২৯ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, শনিবার ও রবিবার, চা বাগানের মধ্যে একটি মনোরম পরিবেশে ৩৪ তম জপমালা রাণী মা মারীয়ার তীর্থোৎসব মহা সমারোহে পালন করতে যাচ্ছি। উক্ত তীর্থযাত্রায় সকল খ্রিস্টভক্ত ভাইবোনদের বিশ্বাসের যাত্রায় একতাবদ্ধ হয়ে মায়ের কাছে প্রার্থনা নিবেদনের জন্য আহ্বান জানাই।

উক্ত তীর্থোৎসবে আপনি/আপনারা সকলে আমন্ত্রিত।
পর্বকর্তার শুভেচ্ছা দান = ৫০০/- টাকা (তদূর্ধ্ব)
খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য = ২০০/- টাকা
এছাড়াও অন্যান্য স্বেচ্ছাদান/মানত সাদরে গ্রহণ করা হবে।

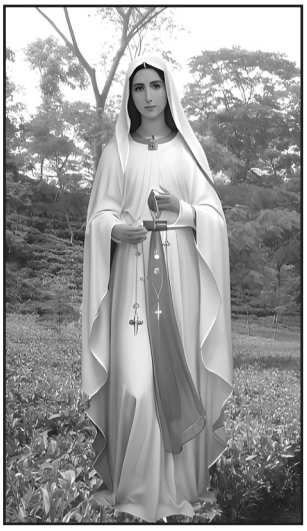

অনুষ্ঠান সূচী:-

১৮ তারিখ হতে ২৬ তারিখ পর্যন্ত নভেনা : সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিট

শনিবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিশপ ও যাজকদের আগমন	: বিকাল ৪:৩০ মিনিট
অভ্যর্থনা ও আশীর্বাদ প্রদান	: বিকাল ৪:৪৫ মিনিট
উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগ	: সন্ধ্যা ৬:০১ মিনিট
আলোর শোভাযাত্রা সহকারে জপমালা প্রার্থনা	: সন্ধ্যা ৭:৩০ মিনিট
আরাধনা ও পাপস্বীকার	: রাত ০৯:৩০ মিনিট

রবিবার, ২৯ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

ক্রুশের পথ	: সকাল ৯:০০ মিনিট
মা মারীয়ার সম্পর্কে সহভাগিতা	: সকাল ১০:০০ মিনিট
মহা খ্রিস্টযাগ	: সকাল ১১:০০ মিনিট
ধন্যবাদ জ্ঞাপণ	: মহা খ্রিস্টযাগের পর

খ্রিস্টেতে -

শ্রীমঙ্গল ধর্মপল্লীবাসীর পক্ষে,

ফাদার জেমস্ শ্যামল গমেজ, সিএসসি
পাল-পুরোহিত ও সভাপতি
তীর্থোৎসব কেন্দ্রিয় কমিটি
শ্রমিক সাধু যোসেফের ধর্মপল্লী, শ্রীমঙ্গল।
মোবাইল: ০১৭৫২-৯২০৪৮৪

মি. ডমনিক সরকার রনি
সেক্রেটারী
তীর্থোৎসব কেন্দ্রিয় কমিটি
শ্রমিক সাধু যোসেফের ধর্মপল্লী, শ্রীমঙ্গল
মোবাইল: ০১৭১২-৬০০৩৬৬

বিজ্ঞ/৩০৩/২৩

আলোচিত সংবাদ

অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করাই উদ্দেশ্য: যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেছেন, ভিসা রেকর্ড গোপনীয় হওয়ায় আমরা নির্দিষ্ট সদস্য বা ব্যক্তির নাম প্রকাশ করিনি। তবে এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে এগুলো আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য, ক্ষমতাসীন দল এবং রাজনৈতিক বিরোধী দলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। গতকাল ওয়াশিংটনে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে মিলার কথা বলেন। ব্রিফিংয়ে মিলারের কাছে প্রশ্ন ছিল, বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত গত ২৪ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে নতুন ভিসা বিধিনিষেধে গণমাধ্যম ও সাংবাদিকদের অন্তর্ভুক্তির ঘোষণা দিয়েছেন এবং এই বিষয়টি ব্যাপক উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। আপনি কি মনে করেন না যে, এই নিয়েধাজ্ঞা যদি মিডিয়াতে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে মানবাধিকার, বাকস্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের আহ্বানকে দুর্বল করবে? জবাবে মিলার বলেছেন, ভিসা রেকর্ড গোপনীয়, তাই নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির নাম প্রকাশ করা হয়নি। আর ভিসা নীতির লক্ষ্য হলো, কোনো পক্ষ নেওয়া নয়; বরং বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ জাতীয় নির্বাচন নিশ্চিত করা বা সমর্থন করা। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তি ও বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র মিলার বলেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী গত মে মাসে নতুন ভিসা নীতি ঘোষণা করেন। সে সময় উদ্দেশ্য ছিল কোনো পক্ষ নেওয়া নয়; বরং বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ জাতীয় নির্বাচন নিশ্চিত করা বা সমর্থন করা। এগিকে, ভিসা নীতি নিয়ে ঢাকার যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের মুখপাত্র ব্রায়ান মিলার বলেছেন, যে কাউকে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচন 'ক্ষুণ্ন' করতে দেখা গেলে, ভিসা নিষেধাজ্ঞার নীতিটি তার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, এর মধ্যে ভোট কারচুপি, ভোটারদের ভয় দেখানো, জনগণকে তাদের সংগঠনের স্বাধীনতা এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশের স্বাধীনতার অধিকার প্রয়োগ করেত বাঁধা দেওয়ার জন্য সহিংসতার ব্যবহার এবং রাজনৈতিক দল, ভোটার, সুশীল সমাজ বা মিডিয়াকে বাঁধা দেওয়ার বিষয়ে যে কোনো পরিকল্পিত ব্যবস্থার ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

বায়ু দূষণে বিশ্বে ঢাকার অবস্থান ২য়

বিশ্বের ১০০ শহরের মধ্যে বায়ুদূষণে ঢাকার অবস্থান দ্বিতীয়। এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সে (একিউআই) স্কোর-১৫৮

একিউআই স্কোরে দূষিত বায়ুর শীর্ষে আছে পাকিস্তানের করাচি, স্কোর ২৬৪। তৃতীয় স্থানে রয়েছে কুয়েতের কুয়েত সিটি, স্কোর ১৫৬। ১৫৩ স্কোর নিয়ে তালিকায় চতুর্থ স্থানে রয়েছে মালয়েশিয়ার কুচিং। পঞ্চম স্থানে রয়েছে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর, স্কোর ১৫৩।

এ ছাড়া একইসময়ে একিউআই স্কোর ১৫৩ স্কোর নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে পাকিস্তানের লাহোর। ১৫৩ স্কোর নিয়ে সপ্তম স্থানে রয়েছে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা। ১৪৯ স্কোর নিয়ে অষ্টম স্থানে রয়েছে ভারতের দিল্লি। ১১৬ স্কোর নিয়ে নবম স্থানে রয়েছে চীনের বেইজিং। ১১৪ স্কোর নিয়ে দশম স্থানে রয়েছে চীনের সাংহাই।

তথ্যমতে, একিউআই স্কোর শূন্য থেকে ৫০ ভালো হিসেবে বিবেচিত হয়। ৫১ থেকে ১০০ সহনীয় হিসেবে গণ্য করা হয়। আর সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয় ১০১ থেকে ১৫০ স্কোর। ১৫১ থেকে ২০০ পর্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয়।

একইভাবে একিউআই স্কোর ২০১ থেকে ৩০০ এর মধ্যে থাকলে 'খুব অস্বাস্থ্যকর' এবং স্কোর ৩০১ থেকে ৪০০ এর মধ্যে থাকলে 'বিপজ্জনক' বলে বিবেচিত হয়। বায়ুদূষণ গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করে। এটা সব বয়সী মানুষের জন্য ক্ষতিকর। তবে শিশু, অসুস্থ ব্যক্তি, প্রবীণ ও অন্তঃসত্ত্বাদের জন্য বায়ুদূষণ খুবই ক্ষতিকর।

ঢাকায় বায়ু দূষণের জন্য ইটভাটা, যানবাহনের ধোঁয়া ও নির্মাণ সাইটের ধুলোকে দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা। বায়ুদূষণের ফলে বাড়ছে শ্বাসকষ্ট, কাশি, নিম্ন শ্বাসনালির সংক্রমণ এবং বিষণ্নতার ঝুঁকি।

পারমাণবিক অস্ত্র নির্মূলে অধিকতর আন্তর্জাতিক সংহতির আহ্বান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

পারমাণবিক অস্ত্র সাধারণ ও সম্পূর্ণ নির্মূলের মাধ্যমে একটি নিরাপদ বিশ্ব নিশ্চিতকরণে অধিকতর আন্তর্জাতিক সংহতির আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। নিউইয়র্কের স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (২৬ সেপ্টেম্বর) পারমাণবিক অস্ত্র সম্পূর্ণ নির্মূলবিষয়ক আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে আয়োজিত এক উচ্চ পর্যায়ের সভায় এমন আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'পৃথিবীতে যতদিন পরমাণু অস্ত্র থাকবে, ততদিন আমরা কেউ নিরাপদ নই। কারণ পারমাণবিক অস্ত্র সারা বিশ্বে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে মৃত্যু ও ধ্বংস ঘটায়।

কেবল পারমাণবিক অস্ত্রের সম্পূর্ণ নির্মূলই মানব জাতির এই হুমকির সুনিশ্চিত সমাধান।'

ড. মোমেন বিশ্বব্যপী পারমাণবিক অস্ত্রের সাধারণ ও সম্পূর্ণ নির্মূল এবং পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তি বাস্তবায়নের প্রতি বাংলাদেশের সুদৃঢ় অঙ্গীকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি এই চুক্তির সদস্য রাষ্ট্রসমূহের প্রথম বৈঠক, এতে গৃহীত রাজনৈতিক ঘোষণাপত্র এবং ৫০-দফা কর্মপরিকল্পনাকে স্বাগত জানান। সেই সঙ্গে পারমাণবিক অস্ত্রধারী রাষ্ট্র এবং নিউক্লিয়ার আম্ব্রেলা রাষ্ট্রসহ সকল রাষ্ট্রের পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

বক্তব্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের ঝুঁকির কথাও তুলে ধরেন- তা উদ্দেশ্যমূলক হোক বা দুর্ঘটনাজনিত হোক। তিনি বলেন, এই বিধ্বংসী অস্ত্রগুলো পরিচালনা করার বহুমুখী চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। পরমাণু অস্ত্রধারী দেশগুলোকে সন্ত্রাসবাদী বা অন্য অনুমোদিত অপশক্তির হাতে পারমাণবিক অস্ত্র পড়ার ঝুঁকি এড়াতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

বিশ্বব্যাপী শান্তির সংস্কৃতি লালন, পরমাণুমুক্ত বিশ্বের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা এবং নিরস্ত্রীকরণ আলোচনা পুনরায় শুরু করার আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, সভাটিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ বিভিন্ন দেশের উপরাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত ও অন্যান্য উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

শিখ নেতা হত্যা: ভারত-কানাডা সম্পর্কে দীর্ঘস্থায়ী ফাটলের আশঙ্কা

বেশ কিছুদিন ধরে ভারত-কানাডার সম্পর্কে টানাপড়েন চলছে। সম্প্রতি জি-২০ সম্মেলনে ট্রুডো- মোদির দ্বিপাক্ষিক আলোচনা বাতিল, শুল্কমুক্ত বাণিজ্য আলোচনা স্থগিতসহ দুই দেশের সম্পর্কের এই বিষয়টির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এর মাঝেই যেন এক বোমা ফাটালেন ট্রুডো। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো সোমবার জানান, জুনে ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় শিখ সম্প্রদায়ের নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরকে খুনের ঘটনার সঙ্গে ভারতীয় এজেন্টদের যুক্ত থাকার বিষয়ে তার সরকারের কাছেওবিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ আছে। ট্রুডোর এই বিস্ফোরক মন্তব্যের ফলে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও তিক্ত হতে পারে বলে ভাবছেন বিশ্লেষকরা। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকবার কানাডায় শিখ স্বাধীনতাকামীদের নানা উদ্যোগ নিয়ে নয়াদিল্লি তাদের অসন্তুষ্টির কথা অটোয়াকে জানিয়েছে। হাউস অব কমন্সে বক্তব্য রাখার সময় ট্রুডো জানান, তিনি এই মাসের শুরুর দিকে অনুষ্ঠিত জি-২০ সম্মেলনের সময় এই শিখ নেতাকে হত্যার সঙ্গে ভারতের সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সামনে সবিস্তারে তুলে ধরেন। কানাডা সরকারের জোগাড় করা তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে তিনি এই উদ্যোগ নেন বলে জানান তিনি।

ট্রুডো আরও বলেন, কানাডার মাটিতে কানাডীয় নাগরিককে হত্যার সঙ্গে বিদেশি সরকারের জড়িত থাকার বিষয়টি আমাদের সার্বভৌম কানাডার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। বিষয়টি সুরাহার জন্য ভারত সরকারকে আহ্বান জানান ট্রুডো। আইনপ্রণেতাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, স্বাধীন শিখ রাষ্ট্রের পক্ষে সোচ্চার হরদীপের হত্যাকাণ্ডের তদন্তে সহায়তা করতে ভারতের ওপর চাপ দেবেন তিনি।

কানাডা সরকারের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানান, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা হরদীপের হত্যা-রহস্যের তদন্তে একসঙ্গে কাজ করেছে। গতকাল মঙ্গলবার তিনি করেন, যৌথ তদন্তেই উঠে এসেছে ভারতীয় এজেন্টদের জড়িত থাকার বিষয়টি।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি বলেন, কানাডার কাছে যে তথ্যপ্রমাণ আছে, তা "সময়মতো" প্রকাশ করা হবে।

গতকাল যুক্তরাষ্ট্র জানায়, তারা কানাডার তদন্তে সহায়তা করেছে।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেছেন, এ বিষয়ে কানাডার কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। তারা এই অভিযোগ নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন। তারা মনে করেন, বিষয়টি নিয়ে পূর্ণ ও স্পষ্ট তদন্ত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। তারা ভারত সরকারকে এই তদন্তে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করবেন।

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ প্রতিদিন, আমাদের সময়, প্রথম আলো, যুগান্তর

রুম নং থ্রি-টোয়েনটি

সংগ্রামী মানব

হাজারো পাখির কলকাকলিতে এই ভূবন পুলকিত। হতাশার গ্লানি মানব হৃদয় থেকে বিতারিত হয়েছে। সত্যিই কি তাই? এ যে অমোঘ বিকেল। সুমি রোজারিও একজন উঠতি বয়সী তরুণী। গায়ে-গরণে, সুনাম-খ্যাতিতে বেশ প্রশংসিত। তিনজন ভাই-বোনের মধ্যে সবার ছোট ও আদরের সুমি। স্কুল জীবন শেষ করে সবে মাত্র কলেজ জীবন শুরু করেছে। কলেজে যেতে অনীহা থাকলেও সবসময়ই কলেজে যায় সে। জ্যৈষ্ঠের প্রথম সোমবার, কলেজে যাওয়ার জন্যে সুমি বের হল। ছোট পায়ে এগুচ্ছে সে। পথমধ্যে তার কানে ভেসে এলো সানাইয়ের সুর। করুণ সুরে বরণ করছে অন্যায়-অবিচার, মোহ-মায়া ও জড়াজীর্ণতাকে। সুমি এগোতে লাগল। সানাইয়ের সুর তার পিছু ছাড়ছে না। সে হাঁটতে লাগল স্কুল নয় বরং সানাইয়ের দিকে। খুব দেখার ইচ্ছে কি হচ্ছে সেখানে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে সে এসে পরল বিয়ে বাড়িতে। মধ্যবয়স্ক এক লোককে ডেকে বলল, ওহে বাবু, ওখানে কী হচ্ছে? লোকটি বলে, আমি জগদীশ। আমারই মেয়ের বিয়ে আজ। এসো মা ভেতরে এসো। সুমি ভেতরে গিয়ে দেখে একজন নাবালিকা হলুদ শাড়ী পরে বসে আছে। সুমি জিজ্ঞেস করল, বাবু ও কি আপনার মেয়ে? বাবু জগদীশ উত্তরে বলল, হ্যাঁ মা। একজন নাবালিকা মেয়েকে আপনি বিয়ে দিচ্ছেন, আপনার কি একটুকুও কষ্ট লাগে না? কি আর করবো রে মা, অভাবের তাড়নায় আমাকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হল। না খেয়ে থাকার চেয়ে অন্যের ঘরে গিয়ে দু-চারটে খেয়ে বেঁচে থাকাটাই মঙ্গল। গ্রামীন মানুষ, অতসব বুঝি না। সুমি অবাক দৃষ্টিতে তাঁকিয়ে রইল নাবালিকার দিকে। একটু এগিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী নাম তোমার? মেয়েটি বলল, আমি অদিতী, বলে মেয়েটি অঝোরে কাঁদতে লাগলো। কাঁদো স্বরে বলল, আমাকে বাঁচাও দিদি। আমি বিয়ে করতে চাই না। আমি পড়ালেখা করতে চাই। মানুষের মত মানুষ হতে চাই। নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই। সুমি বলল, অদিতী আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই। কিন্তু এখানে না বরং নিরিবিলি কোন স্থানে। অদিতী বলল, এসো দিদি আমার সাথে এসো। দুজন ধীরপায়ে এগোচ্ছে। এসো দিদি ওই যে দেখা যায় ঘর, ওখানে যাই। সামনে এগোতেই সুমির চোখে পড়ল, দরজার প্রধান ফটকে লেখা, রুম নং থ্রি-টোয়েনটি। তারা দু'জন ঘরে প্রবেশ করল। অদিতী সুমিকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে লাগলো। অদিতী বলল, আমি বিয়ে করতে চাই না দিদি। আমাকে তুমি রক্ষা কর। আর কিছুই বলতে পারলো না সে। সুমি তাকে সান্ত্বনা দিলো এবং পুনরায় তাকে আগের স্থানে পৌঁছে দিল। সুমি বিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে দৌড়ে স্কুলের দিকে রওনা হল। স্কুলের প্রধান ফটকে দাঁড়িয়ে প্রধান শিক্ষক বাবু হরিপদ। এই সুমি, এভাবে দৌড়চ্ছো কেন? স্যার একটি অঘটন ঘটে যাচ্ছে। একজন নাবালিকার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। বল কী। কোথায়? সুমি বলল, কেশবপুরে, বাবু জগদীশের মেয়ে। ইতিমধ্যে বাবু হরিপদ স্কুলের সংকেত ধ্বনি বাঁজিয়ে দিল। সকল শিক্ষার্থীদের একত্রিত করল। এবার সুরেলা কণ্ঠে বলতে শুরু করল, প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমি এই মাত্র শুনেছি, তোমাদের মত একজন নাবালিকার নাকি বিয়ে হচ্ছে। নাবালিকার অনিচ্ছা থাকা সত্তেও তাকে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা চরম অন্যায়। বাবু হরিপদ উচ্চস্বরে বলল, তোমরা বল, এই বিয়ে কী হতে দেওয়া যায়? সবাই বলল, না না না। কখনও না। এই বিয়ে আমরা হতে দিব না। বাবু হরিপদ বলল, তাহলে চল সবাই। এসো আমার সাথে। বিয়ে বাড়িতে এত শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের আগমনে বাবু জগদীশ ভীষণ ভয় পেল। শিক্ষদের সাথে কথা বলে বাবু জগদীশ বিয়েটি বন্ধ করে দিল। শিক্ষর্থীরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পরল। অদিতী উঠে দাঁড়িয়ে সুমিকে পুণরায় রুম নং থ্রি-টোয়েন্টিতে নিয়ে গেল। কাঁদো স্বরে অদিতী বলল, দিদি তোমায় অশেষ ধন্যবাদ। ধন্যবাদ রুম নং থ্রি-টোয়েন্টিকে। সুমির চোখ পুনরায় রুম নং থ্রি-টোয়েন্টির দিকে। মুঁচকি হেঁসে বিদায় নিলো॥

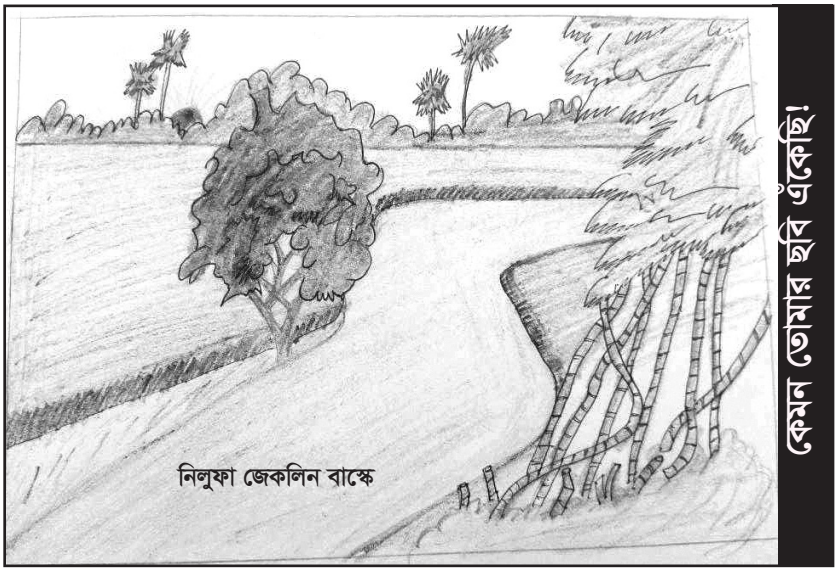

নিলুফা জেকলিন বাস্কে

ভাল বাসা: ভালোবাসা

উদাস পথিক

ভাল বাসা খুঁজি ফিরি
ভালোবাসার টানে, ঘর বাঁধার আহ্বানে,
ঘর বাঁধি ভালোবাসার জয়গানে
একতার শক্তি ও বন্ধন দৃঢ় করার লক্ষ্যে।

ভাল বাসা শান্তির নীড়
ভালোবাসা দু'টি মনের মিল,
ভাল বাসা জীবনের নিরাপত্তা
ভালোবাসা মিলনের যাত্রা।

ভাল বাসায় সুখে থাকি
ভালোবাসায় সর্বদা সুখ দুঃখ ভাগ করি,
ভাল বাসা পার্থিব,
ক্ষয়িষ্ণু ও ভঙ্গুর
ভালোবাসা চির মধুর, চির নতুন॥

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

‘প্রভুর প্রশংসা’ নামে জলবায়ুর উপর পোপ মহোদয়ের পরবর্তী প্রৈরিতিক প্রেরণাপত্র

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরদের সাথে পোপ ফ্রান্সিস

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

গত বৃহস্পতিবার (২১ সেপ্টেম্বর) লাতিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রায় ২০০জন রেক্টরদের সাথে কথা বলার সময় পোপ মহোদয় প্রকাশ করেন যে, তাঁর পরবর্তী প্রৈরিতিক প্রেরণাপত্র হবে জলবায়ুর উপর ‘প্রভুর প্রশংসা’ নামে। উক্ত অনুষ্ঠানে শিক্ষাবিদদের দ্বারা উত্থাপিত জলবায়ু পরিবর্তন, অভিবাসন ও অপচয়ের সংস্কৃতি বিষয়ক ইস্যুসহ বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে পোপ মহোদয় অনুধ্যান রাখেন।

বর্তমানের বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ দেখে যুবকদের গঠনদানের কাজে সৃজনশীল হতে পুণ্যপিতা শিক্ষাবিদদের প্রতি জোর আবেদন রাখেন। রেক্টরগণ পরিবেশগত ও জলবায়ু সংক্রান্ত বিষয়ে পোপ মহোদয়কে বিভিন্ন প্রশ্ন করলে পুণ্যপিতা ‘ছুঁড়ে ফেলা দেওয়া ও পরিত্যাগের সংস্কৃতির’ ভয়াবহতা তুলে ধরেন। তিনি ব্যাখা করে বলেন, এটি হলো প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহারের সংস্কৃতি; যা প্রকৃতিকে পূর্ণ বিকশিত হতে সহায়তা করে না বা জীবিত থাকতেও দেয় না। পরিত্যাগের এই সংস্কৃতি আমাদের সকলের জন্যই ক্ষতিকর।

প্রকৃতির যথার্থ ব্যবহার: মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে পোপ ফ্রান্সিস বর্ণণা করে বলেন, ছুঁড়ে ফেলার সংস্কৃতি সর্বদাই চলমান রয়েছে; কিন্তু যা থেকে যায় তা ব্যবহার করার, সেগুলিকে পুনরায় তৈরি করার, সেগুলিকে সাধারণ ব্যবহারের ক্রম অনুসারে প্রতিস্থাপন করার শিক্ষার অভাব রয়েছে। এ ধরণের ছুঁড়ে ফেলে দেবার সংস্কৃতি প্রকৃতিকেও প্রভাবিত করে। প্রকৃতিকে যথার্থভাবে ব্যবহারের উপর জরুরিভাবে মনোযোগ দিতে বলেন। বর্তমানে মানবজাতি প্রকৃতির এই অপব্যবহার করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাই অবশ্যই প্রকৃতির যথার্থ ভালো ব্যবহারের পথে ফিরে আসতে হবে। এবং আমরা প্রকৃতিকে কিভাবে ব্যবহার করতে পারি- তাতে আমি বলবো; প্রকৃতির সাথে সংলাপ কর, সংলাপ। এ লক্ষ্যে পোপ মহোদয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সচেতনার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার আহ্বান করেন। একইসাথে তিনি বলেন, আশা পুনরুদ্ধার ও সংগঠিত করা - তোমাদের বলা এই বাক্যাংশটা আমি খুব পছন্দ করি। কেননা তা সার্বিক বাস্তবিদ্যার সাথে বিবেচিত হতে পারে। আজকের যুবকদের একটি সুষম বিশ্বপ্রকৃতি ও আশা করার অধিকার আছে এবং আমরা অবশ্যই সেই আশা সংগঠিত করতে ও এই মুহূর্ত থেকে যেকোন গুরুতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সহায়তা করবো।

সকলের জন্য প্রকৃতি: পোপ ফ্রান্সিস একটি ‘সঞ্জীবনী সংস্কৃতি’কে ইঙ্গিত করে বলেন, এটিকে অর্থনৈতিক সংকটের ফল হিসেবে চিহ্নিত করা যায় যা সবসময় অভাবী মানুষের উন্নয়নের সেবায় থাকে না। অনেকের উন্নয়ন না করে এটি আরো বেশি মানুষের অভাব তৈরি করে। এটি একটি দখলের সংস্কৃতি। প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার ও তা যথার্থভাবে সাধারণ মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করার অধিকার আমাদের সকলেরই রয়েছে। আর্থ-সামাজিক তত্ত্ব ব্যবহার করে শুধুমাত্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠির জন্য প্রকৃতির সম্পদকে ব্যবহার করার ব্যাপারে আমাদেরকে সচেতন থাকতে হবে। কেননা তা প্রকৃতিকে একীভূত না করে পরিত্যাগ করা হয়।

পোপ মহোদয়ের পরবর্তী প্রৈরিতিক প্রেরণাপত্র ‘প্রভুর প্রশংসা’ : পরিবেশগত সংকট উত্তরণের জন্য বিকল্প কিছু ব্যবহার করার আহ্বান রাখেন পোপ মহোদয়। যেমন- ভাটিকানে বিভিন্ন প্রাসাদে ও হলঘরে সোলার প্যানেল ব্যবহার করে বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা করা। বিদ্যুৎ তৈরি করতে কয়লা ও অন্যান্য উপাদান লাগে যা প্রকৃতিতে সমস্যা সৃষ্টি করে। তাই প্রকৃতিকে রক্ষা করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই সৃজনশীল হতে হবে। এখন থেকেই ভবিষ্যৎ বিশ্ব নেতা সেই যুবদেরকে শিক্ষা দিতে হবে। আগামী ৪ অক্টোবর প্রকৃতিপ্রেমী আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের পর্ব দিবসে পোপ মহোদয়ের নতুন প্রৈরিতিক প্রেরণাপত্র ‘প্রভুর প্রশংসা’ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে বলে জানানো হয়।

মানব ও পরিবেশের অবক্ষয় একসাথে যায়: মানবতা যে অধঃপতনের মধ্যদিয়ে যাচ্ছে পুণ্যপিতা তার নিন্দা করেন। ‘আমরা সাধারণভাবে বলতে পারি, পরিবেশগত অবনতির একটি প্রক্রিয়া আছে। কিন্তু তা নীচের দিকে এমনকি গিরিখাতের পাদদেশে ধাবিত করে। জীবনযাত্রার অবস্থার অবনতি, মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রভৃতি আমাদের জীবনাবস্থার মান নির্ণয় করে। কেননা এগুলো একসাথে যায়।

রাজনীতি উত্তম পেশা: সংকটময় বাস্তবতার মুখোমুখি অবস্থানে থেকে পোপ মহোদয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরদের মানবীয় মূল্যবোধ ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সংলাপ বৃদ্ধিকল্পে ছাত্রদেরকে রাজনীতির মতো উত্তম পেশায় প্রবেশ করতে সহায়তা করতে বলেন। তিনি বলেন, আমরা যেন ভুলে না যাই, মানব ব্যক্তিদের জন্য রাজনীতি অন্যতম একটি উত্তম পেশা ও আহ্বান। তাই এসো আমরা আমাদের যুবকদেরকে উত্তম রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠার জন্য শিক্ষা দান করি। শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলে সক্রিয় হওয়াই নয় কিন্তু রাজনৈতিক উদারতা নিয়ে বিভিন্ন দল ও ব্যক্তির সাথে সংলাপ করার পারদর্শিতায় তাদেরকে প্রশিক্ষিত করি।

বিভিন্ন অনুধ্যান ও পরামর্শদানের পর পোপ মহোদয় বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুধুমাত্র শিক্ষাদান নয়। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদেরকে তিনটি মানবীয় ভাষার তথা - মাথার বা বুদ্ধির; হৃদয়ের বা ভালোবাসার এবং হাতের বা বাস্তবধর্মী কাজের শিক্ষা দিতে হবে। - **তথ্যসূত্র :** *news.va*

ফ্ল্যাট বিক্রয়

অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, মহাখালি দক্ষিন পাড়া (খ্রিস্টান পাড়া) মনোরম পরিবেশে একটি ফ্ল্যাট বিক্রয় করা হবে।

ফ্ল্যাটের বিবরণ: ৪র্থ তলায়- ১১৫০ স্কয়ার ফিট, ৩ বেডরুম এটাস্ট বাথরুম, দুইটি বারান্দা, ড্রইং- ডাইনিং, কিচেন ও একটি গাড়ি রাখার গ্যারেজ।

যোগাযোগ : ০১৭১৫০৩৪৮৯৮

বিজ্ঞ/৩০০/২৩

“অনলাইনে খ্রিস্টীয় উপস্থিতি ও আমাদের সৃজনশীল কর্ম” বিষয়ক মিডিয়া সেমিনার

সিস্টার লাইলী রোজারিও আরএনডিএম ▯ গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, ঢাকা তেজগাঁও ধর্মপল্লীর মাদার তেরেজা কমিউনিটি সেন্টারে মিডিয়া বিষয়ে “অনলাইনে খ্রিস্টীয় উপস্থিতি ও আমাদের সৃজনশীল কর্ম” এর উপর ভিত্তি করে সামাজিক যোগাযোগ

কমিশন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ ও বাণীদীপ্তি, খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের সহোযোগিতায় বিশেষ এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারের মূল উদ্দেশ্য ছিল অনলাইনে মিডিয়ায় অর্ন্তভূক্ত খ্রিস্টান উদ্যোক্তাদের খ্রিস্টীয় ভাবধারায় অনলাইনে লেখার মান, বিষয়বস্তুর উপস্থাপন এবং এর সঠিক ও অর্থপূর্ণ ব্যবহার সমন্ধে সকলকে অবগত করা।

এছাড়া ও অন্যতম বিষয় ছিল বাণীদিপ্তী কর্তৃক বিটিভি‘র সকল শিল্পীবৃন্দদের ইস্টার অনুষ্ঠান - ২০২৩ এর পুনর্মিলনী ও শিল্পীসম্মানী প্রদান।

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পরিচালক ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু। তিনি বলেন, “আমরা যারা মিডিয়া অনলাইনে কাজ করছি আমাদের লক্ষ্য থাকে বর্তমান বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বিষয় তৈরি করা যা অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়।”

“আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এই মিডিয়ার মধ্যদিয়ে যেন আমরা সত্যকে প্রকাশ ও প্রচার করতে পারি।”

মুক্ত আলোচনায়, লেখক ফোরামের সাংস্কৃতিক সেক্রেটারি মিনু গরেট্টি কোড়াইয়া বলেন, “আমরা যারা অনলাইনে কাজ করি আমাদের সবারই সুযোগ রয়েছে নিজস্ব কিছু অনুভূতি তুলে ধরার। কিন্তু খ্রিস্টান হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের উচিত অনলাইন সৃজনশীলতায় মধ্য দিয়ে খ্রিস্টীয় ভাব তুলে ধরা।”

অতপর বাণীদিপ্তীর কর্তৃক আয়োজিত ইস্টারের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকল শিল্পীবৃন্দদের সাথে পুনর্মিলনী উৎসবকে কেন্দ্র করে কেক কাটা হয় এবং শিশু শিল্পীদের জন্য বিশেষ পুরস্কার এবং অন্যান্যদের জন্য বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে মিডিয়ার অনলাইনের সাথে জড়িত খ্রিস্টান বিভিন্ন মিডিয়ার ব্যক্তিবর্গ এবং বাণীদিপ্তীর সকল শিল্পীবৃন্দ সহ আনুমানিক ৪৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

পরিশেষে, বাণীদিপ্তীর কো-অর্ডিনেটর এবং রেডিও ভেরিতাসের প্রযোজক, সিস্টার লাইলী রোজারিও আরএনডিএম সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্যদিয়ে সেমিনারের সমাপ্ত ঘোষণা করেন॥

তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল সেমিনার - ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষ

সিস্টার মেরী তৃষিতা, এসএমআরএ ▯ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির সহযোগিতায় এবং তেজগাঁও ধর্মপল্লীর আয়োজনে “মিলন ও একতার উৎস যিশু, ভালোবাসেন সকল শিশু”- এই মূলসুরের আলোকে বিগত ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষ রোজ শুক্রবার ধর্মপল্লীতে ধর্মপল্লীর শিশু ও এনিমেটরদের নিয়ে

শিশুমঙ্গল সেমিনার করা হয়। সেমিনারের শুরুতেই পাল-পুরোহিত ফাদার সুব্রত বি গমেজ সবার উদ্দেশে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। তিনি মূলসুরের আলোকে পথ চলার জন্য শিশুদের বিভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত করেন। এরপর র‍্যালি করে বাণী প্রচারধর্মী শ্লোগানসহ শিশু ও এনিমেটরগণ পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণের জন্য গির্জাঘরে প্রবেশ করেন। খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ, তাকে সহযোগিতা করেন তেজগাঁও ধর্মপল্লীর ফাদার সনি রোজারিও ও ফাদার ঝলক আন্তনী দেশাই। উপদেশে ফাদার বলেন, “ শিশুরা খুবই সরল, তারা ঝগড়া বিবাদ করলেও খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যায়, তিনি শিশুদেরকে মা-বাবার বাধ্য হয়ে চলার, ভালোভাবে লেখা-পড়া করতে এবং প্রার্থনার প্রতি অনুরাগী হতে উৎসাহিত করেন।” টিফিন বিরতির পর ফাদার প্রলয় ডি’ ক্রুশ মূলসুরের উপর মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে তার প্রাণবন্ত সহভাগিতা উপস্থাপন করেন। এরপর

সিস্টার ঝুমা নাফাক এসএসএমআই জাতীয় পিএমএস, বাংলাদেশের কার্যক্রম সবার সাথে সহভাগিতা করেন। ফাদার সনি রোজারিও ও সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ-এর পরিচালনায় শিশুদের জন্য শ্রেণিভিত্তিক বাইবেল কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ও বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। একইসাথে ঢাকামহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির পক্ষ থেকে এনিমেটর ও শিশুদের মাঝে যিশু ও মা-মারীয়ার ছবি উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়। ফাদার সনি এবং ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় শিশু মঙ্গল কমিটির সেক্রেটারি সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের মধ্যদিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে। সেমিনারে ১৭৪জন শিশু, ১৫ জন এনিমেটর, ৬ জন সিস্টার এবং ৫ জন ফাদার অংশগ্রহণ করেন। শিশুমঙ্গল সেমিনার সার্থক ও ফলপ্রসূ করার জন্য ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত, সহকারি পাল-পুরোহিতদ্বয়, সিস্টারগণ ও এনিমেটরগণ সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা করেন॥

পরিবারে জপমালা বিষয়ক সেমিনার

ফাদার উজ্জ্বল রিবেরু ▯ "এসো জপমালা করি, কুমারী মারীয়ার আদর্শে জীবন যাপন করি"-উক্ত মূলসুরকে কেন্দ্র করে চাঁদপুকুর ধর্মপল্লী ও হলিক্রস ফ্যামিলি মিনিস্ট্রিস, রাজশাহীর যৌথ উদ্যোগে গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষ সারাদিন ব্যাপি চাঁদপুকুর ধর্মপল্লীতে শাশুড়ি মা ও বৌ-মায়েদের নিয়ে সেমিনার করা হয়। সকাল ১০ টায় প্রার্থনা, প্রদীপ প্রজ্বালন ও গানের মধ্যদিয়ে সেমিনারের শুভ উদ্বোধন করেন চাঁদপুকুর ধর্মপল্লীল পাল-পুরোহিত ফাদার বেলিসারিও সিরো মন্তোয়া। উক্ত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন ফাদার প্রশান্ত টি আইন্দ, ফাদার উজ্জ্বল রিবেরু, সিস্টার রাণী সরেন, সিস্টার মিরাল্লা হাঁসদা, ক্যাটিখিস্ট মাস্টার হপিন হাঁসদাসহ বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত মোট ১৬৭ জন মা।

সেমিনারের শুরুতেই পাল-পুরোহিত ফাদার বেলিসারিও সিরো মন্তোয়া সকল মাকে স্বাগত জানান এবং পরিবারে সকলকে নিয়ে রোজারিমালা প্রার্থনা করার অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, পরিবারের রাণী মা-মারীয়া, যিনি আমাদের সকল মায়ের আদর্শ।

উক্ত সেমিনারের প্রধান বক্তা ফাদার প্রশান্ত টি আইন্দ মারীয়ার জীবন, তার দর্শন দানের ঘটনা, প্রণাম মারীয়া প্রার্থনার ও জপমালা প্রার্থনার ইতিহাস এবং ব্যক্তি জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা ও শিক্ষা প্রদান করেন। তিনি বলেন, একজন যাজক হিসেবে রোজারি মালা প্রার্থনা আমাকে পবিত্রতার পথে চলতে সাহায্য করে এবং আমি বিশ্বাস করি পরিবারে জপমালা প্রার্থনার মধ্যদিয়ে পারিবারিক উন্নতি ও শান্তি আসবে।

পরবর্তীতে দুপুরের আহারের পর শোভাযাত্রা করে রোজারি মালা প্রার্থনা করে গির্জাঘরে প্রবেশ করা এবং পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগের পর দলীয় ছবি এবং উপহার হিসেবে সবাইকে মা-মারীয়ার ছবি প্রদান করা হয়॥

কাটাডাঙ্গা ধর্মপল্লীতে বিশ্বরাণী মারীয়া সংঘের পর্ব পালন

ফাদার সমর দাংগ ওএমআই ▯ সাধু পৌলের গির্জা, কাটাডাঙ্গা ধর্মপল্লীতে ২৫-২৬ আগস্ট, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে দুইদিন ব্যাপী বিশ্বরাণী মারীয়া সংঘের সকল সদস্যাগণ তাদের সংঘের প্রতিপালিকা বিশ্বরাণী মা মারীয়ার পর্ব পালন করেন। সংঘের সদস্যাগণ প্রথম দিন বিকালের মধ্যেই এসে আধ্যাত্মিক ধ্যান প্রার্থনার মাধ্যমে পর্ব পালন শুরু করেন। দ্বিতীয় দিন পর্বীয় খ্রিস্টযাগ এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পর্ব উদ্‌যাপন সমাপ্ত করেন।

পর্বীয় খ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করেন বিশপ জের্ভাস রোজারিও। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তগণও যোগ দিয়েছিলেন। খ্রিস্টযাগের পরই বিশপ মহোদয় মারীয়া সংঘের সদস্যাদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন। বিশপ মহোদয় তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন, আমাদের দেহের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেমন নিজ নিজ দায়িত্ব কর্তব্য পালন করেন। তেমনি একে অপরের সাথে সাথে যুক্ত থেকে নিজ নিজ কাজ করতে হবে। খ্রিস্টভক্ত হিসেবে যেন আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করি, একে অপরকে ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি, একতা বজায় রাখি, নিজেদের দায়িত্ব পালন করি॥

বরেন্দ্রদূত এর সৌজন্যে

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

মট্‌স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি

তিন (৩) বছর মেয়াদী কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স (এলটিএমসি)

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি-আবাসিক

আগামী ০২ জানুয়ারী ২০২৪ হতে মট্‌স-এ তিন (৩) বছর মেয়াদী (ব্যাচ-৪৮) কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হবে। নিম্ন বর্ণনা অনুযায়ী যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে আগামী ১৯ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখের মধ্যে ৭ নং অনুচ্ছেদে লিখিত ঠিকানায় দরখাস্ত আহবান করা যাচ্ছে ।

১। প্রার্থীদের যোগ্যতা :

(ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা : এস.এস.সি. পাশ **(খ) বয়স সীমা** : ১ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে ১৫ থেকে ২০ বছর
(গ) বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত **(ঘ) আর্থিক অবস্থা** : অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র পরিবারের গ্রামীণ মেধাবী যুবক
(ঙ) অগ্রাধিকার : আদিবাসী ও কারিতাসের ভূমিহীন সহযোগী দলের পরিবারের সদস্য/ পোষ্য

২। প্রশিক্ষণ বিষয়:

(ক) অটোমোবাইল : অটোমোবাইল এবং কৃষিকাজে ব্যবহৃত ইঞ্জিন এবং যন্ত্রপাতি সংযোজন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, ওয়েল্ডিং ও সীট মেটাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইত্যাদি কাজের প্রশিক্ষণ

(খ) মেশিনিষ্ট : লেদ, মিলিং, ড্রিলিং, গ্রাইন্ডিং ও অন্যান্য মেশিনে যন্ত্রাংশ তৈরী, মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ, ওয়েল্ডিং ও সীট মেটাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইত্যাদি কাজের প্রশিক্ষণ

৩। প্রশিক্ষণ পদ্ধতি :

(ক) ১ম ও ২য় বর্ষ : কারিতাস সুইজারল্যান্ডের সহায়তায় প্রস্তুতকৃত গাইড লাইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ট্রেডে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ।
(খ) ৩য় বর্ষ : মট্‌স এর উৎপাদন কার্যক্রমের মাধ্যমে বাস্তব ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও তাত্ত্বিক লেখাপড়ার পুনরালোচনা।

৪। বাছাই পদ্ধতি :

(ক) উপরোক্ত যোগ্যতা সাপেক্ষে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাভিত্তিক বাছাই করা হবে (খ) আসন সংখ্যা : ৩০ জন

৫। প্রশিক্ষণ শর্তাবলী :

(ক) প্রশিক্ষণার্থীকে প্রতিষ্ঠানের ছাত্রাবাসে থাকতে হবে।
(খ) প্রতিষ্ঠানের নিয়মশৃংখলা মেনে চলতে হবে।
(গ) নিয়ম শৃংখলা পরিপন্থী অথবা যে কোন কারণে প্রশিক্ষণ ত্যাগ করলে প্রতিষ্ঠানের হিসাব সাপেক্ষে সমস্ত খরচ প্রতিষ্ঠানকে ফেরত দিতে হবে।
(ঘ) **মট্‌স এ থাকা-খাওয়া ও প্রশিক্ষণ খরচের ৭০% মট্‌স ও ৩০% টাকা প্রশিক্ষণার্থীবহন করবে।**
(ঙ) **ভর্তিকালীন ভর্তি ফি ও মেডিক্যাল চেকআপ বাবদ ৮,০০০/- টাকা এবং জানুয়ারী ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের থাকা-খাওয়া ও টিউশন ফি বাবদ ২,৫০০/- টাকা অর্থাৎ সর্বমোট ১০,৫০০/- (দশ হাজার পাঁচশত) টাকা জমা দিতে হবে।**
(চ) **প্রতিমাসের ১০ তারিখের মধ্যে ২,৫০০/-** (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা শিক্ষা ঋণের কিস্তি প্রদান করতে হবে।
(ছ) নির্বাচিত এস.এস.সি পাশ প্রার্থীদের ভর্তির সময় মূল মার্কসশীট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রশিক্ষণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত জমা রাখতে হবে।
(জ) সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারীদের মট্‌স এর সনদপত্র দেয়া হবে এবং চাকুরীর ব্যাপারে সহায়তা করা হবে।

৬। দরখাস্ত করার নিয়ম:

(ক) সাদা কাগজে জীবন বৃত্তান্তসহ নিজ হাতে লিখিত দরখাস্ত দিতে হবে।
(খ) দুই কপি সদ্য তোলা রঙিন পাসপোর্ট সাইজের ছবি দিতে হবে।
(গ) এস এস সি পাশ প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট স্কুল প্রধান কর্তৃক সত্যায়িত এস এস সি মার্কসশীট এবং প্রশংসাপত্রের কপি দিতে হবে।
(ঘ) জন্ম নিবন্ধন/ জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি দিতে হবে।

৭। কোন এলাকার কারিতাসের কোন আঞ্চলিক অফিসে আবেদনকারী দরখাস্ত জমা দিবে তার ঠিকানা :

এলাকার নাম	কারিতাস আঞ্চলিক অফিসের ঠিকানা	এলাকার নাম	কারিতাস আঞ্চলিক অফিসের ঠিকানা
বৃহত্তর ঢাকা ও কুমিল্লা	আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস ঢাকা অঞ্চল ১/সি -১/ডি, পল্লবী, মিরপুর - ১২, ঢাকা-১২১৬	বৃহত্তর বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, মাদারীপুর, শরিয়তপুর ও গোপালগঞ্জ	আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস বরিশাল অঞ্চল সাগরদী, বরিশাল - ৮২০০
বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল	আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল ১৫, ক্যাথলিক পাদ্রী মিশন রোড, ভাটিকেশ্বর, ময়মনসিংহ-২২০০	বৃহত্তর রাজশাহী, পাবনা ও বগুড়া	আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল মহিষবাথান, পো: বক্স-১৯, রাজশাহী - ৬০০০
বৃহত্তর চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী	আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস চট্টগ্রাম অঞ্চল ১/ই বায়েজিদ বোস্তামী রোড, (মিমি সুপার মার্কেটের পিছনে) পূর্ব নাসিরাবাদ পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম	বৃহত্তর দিনাজপুর ও রংপুর	আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস দিনাজপুর অঞ্চল পশ্চিম শিবরামপুর, পোঃ বক্স নং-০৮ দিনাজপুর - ৫২০০
বৃহত্তর খুলনা , যশোর, কুষ্টিয়া , রাজবাড়ী ও ফরিদপুর	আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস খুলনা অঞ্চল রূপসা স্ট্র্যান্ড রোড, খুলনা - ৯১০০	বৃহত্তর সিলেট	আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস সিলেট অঞ্চল সুরমাগেট, খাদিমনগর, সিলেট - ৩১০৩

বি: দ্র: সীমিত সংখ্যক আসনে তিন (৩) বছর মেয়াদী এল.টি.এম.সি কোর্সে মাসিক ৩৫০০ টাকা কোর্স ফি প্রদান সাপেক্ষে অনাবাসিক ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে।

যোগাযোগ:

পরিচালক
মট্‌স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি
১/সি-১/এ, পল্লবী, মিরপুর - ১২, ঢাকা-১২১৬

প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা
মোবাইল : ০১৩২৯৬৩৯৫৪৭, ০১৩২৯৬৩৯৫২১
E-mail: general@mawts.org, Website: www.mawts.org

মট্‌স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি কারিগরি প্রশিক্ষণের একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

বিজ্ঞ/৩০১/২৩

ঈশ্বরের সান্নিধ্যে ১১তম বার্ষিকী

প্রয়াত মিতালী মেরীলিন কস্তা
জন্ম: ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১ অক্টোবর, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

খ্রিস্টের প্রেম হইতে কে আমাদিগকে পৃথক করিবে। রোমীয় ৮:৩৫

মিতালী, মনে পড়ে তোমাকে আর তোমার অবিচ্ছেদ্য ভালবাসাকে। জীবন সুন্দর, আনন্দের, উপভোগের ও পরম পবিত্র পিতা ঈশ্বরের আরাধনার ও তাঁর সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ মানব ও আর্তমানবতার সেবার নিমিত্ত সৃষ্টি। আমাদের জীবন অবধারিত সত্য মৃত্যুর সাথে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত। মৃত্যু নামক চরম সত্যশক্তি আমাদের সবাইকে আকর্ষণ করে চলেছে অনন্ত ধামে নেওয়ার জন্য। যেখানে স্বর্গীয় পিতার স্বর্গীয় অনন্ত আবাস ও অনন্ত বাস। জন্মের সাথে সাথে মৃত্যু আমাদের ছায়ার মত করে আগলে রেখেছে।

মা মিতালী, তুমি ছিলে আমাদের পরিবারের ও সমাজের জন্য এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। মনে পড়ে তোমার স্মৃতিবিজড়িতক্ষণ, খ্রিস্টে তোমার আত্মসমর্পণ, হাসিভরা মুখ, সদাচরণ, অতিথিপরায়ণ মনোভাব যে স্মৃতি মনে পড়লে দু'নয়নের বাঁধ ভেঙ্গে যায় অশ্রুতে, সিক্ত হয় উত্তপ্ত হৃদয়, প্রাণে বাসা বাঁধে নতুন প্রণয় যা ক্ষণস্থায়ী নয়। তুমি ছিলে না রাগিনি কিন্তু ছিলে অনুরাগিনি, ছিলে না হতাশাগ্রস্ত কিন্তু আশ্বস্ত, ক্লেশে- ধৈর্যশীলা, সংকটে- সতর্ক, তাড়নায়- স্থির ও প্রার্থনাপূর্ণ আত্মত্যাগী মানুষ।

তোমার দেখানো আলোর পথে আলোকিত হয়ে আজও আমরা প্রভুর পথে সেবা কাজে সকল শ্রম সাধনা বিনিয়োগ করছি। খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসাবে আমরা তোমার মা-বাবা, ভাই-বোন, গুণগ্রাহী আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশি লোকজন অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত যে তুমি পরম পিতার তত্ত্বাবধানে রয়েছে।

তোমার স্মরণে ও চিরশান্তি কামনায় –
বাবা: সুনীল সেলেষ্টিন কস্তা
মা: মঞ্জু কস্তা ও পরিবারবর্গ
৩৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

বিজ্ঞ/২৯৯/২০২৩

২০২৪ খ্রিস্টাব্দ হতে প্রতিবেশী'র গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ৪০০ টাকা

সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় ৩২টি দেশে গ্রাহক সেবা প্রদান করছে। আপনাদের আমরা একজন নিয়মিত গ্রাহক হিসেবে পেয়ে খুবই গর্ববোধ করছি।

বাংলাদেশের সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, **বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতিবেশী'র গ্রাহক চাঁদার পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি করে ৪০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে, যা না হলেই নয়।** আপনারা জানেন, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর একমাত্র জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা। **এর পথচলা বর্তমানে ৮৩ বছরের।** এতো প্রাচীন পত্রিকার ধারাবাহিক প্রকাশে গ্রাহক হিসেবে আপনাদের অবদান অনস্বীকার্য। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী সব সময়ই সময়ের চাহিদা অনুসারে আপনাদের হাতের কাছে পৌঁছে থাকে। পত্রিকা প্রকাশে আপনাদের অবদানের পাশাপাশি এর খরচের কথাও আমাদের ভাবতে হবে। দিনদিন এর খরচের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। উল্লেখ্য যে, প্রতিবেশী তার নিজস্ব আয় দ্বারা পরিচালিত, কোন অনুদানের উপর নির্ভর করে পত্রিকা প্রকাশ করা হয় না।

একজন গ্রাহকের পিছনে প্রতি সপ্তাহে এক কপির জন্যে প্রায় ২০ টাকা খরচ হয়। বছরে প্রায় ৪৪টি সাধারণ সংখ্যা, একটি ইস্টার সংখ্যা ও একটি বড়দিনের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ একজন গ্রাহকের পিছনে খরচ হয় ৮৮০ টাকা (এখানে কর্মীর বেতন ও অফিস এডমিনিস্ট্রেশন খরচ ধরা হয়নি)। আপনারা বর্তমানে দিচ্ছেন ৩০০ টাকা অর্থাৎ প্রতি কপির জন্যে প্রায় ৬টাকা, এর মধ্যে পাচ্ছেন ১০০ টাকার বড়দিন ও ৩০ টাকার ইস্টার সংখ্যা, **বাকী ১৩ টাকা প্রতি সপ্তাহে প্রতি কপির জন্যে ভর্তুকি বহন করতে হয় প্রতিবেশীকেই, যা বছর শেষে একজন গ্রাহকের পিছনে ভর্তুতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৫৭২ টাকা।** তবে বিজ্ঞাপন বাবদ যে আয় হয় তা সামান্যই ব্যয় কমাতে সাহায্য করে। আবার অনেক গ্রাহক রয়েছেন যারা নিয়মিত গ্রাহক চাঁদা পরিশোধ করেন না।

তাই ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক প্রতিবেশীকে গতিশীল ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক **আগামী ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ জানুয়ারি হতে ৪০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে।** আমাদের আন্তরিক প্রত্যাশা এই প্রতিবেশীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, লালন-পালন করা, আমার আপনার সকলের দায়িত্ব।

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু
সম্পাদক
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ ৮৩ ❖ সংখ্যা - ৩৫
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 35
Regd. No. DA-33
❖ 1 - 7 October, 2023, ১৬ - ২২ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

ফাতেমা রাণীর তীর্থে নিমন্ত্রণ

সম্মানিত সুধী,

সকলের প্রতি রইল বারমারী ফাতেমা রাণীর তীর্থস্থান থেকে খ্রিস্টীয় প্রার্থনাপূর্ণ শুভেচ্ছা। অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আসছে **২৬-২৭ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ; রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বারমারী ধর্মপল্লীতে ফাতেমা রাণী মা মারীয়ার তীর্থ উৎসব ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও ভক্তিপূর্ণ পরিবেশে উদযাপন করা হবে** । এবছরের মূলসুর: "সিনোডীয় মণ্ডলীতে মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ কর্মে ফতেমা রাণী মা মারীয়া"।

আপনারা যারা পর্বকর্তা হতে, মিশার উদ্দেশ্য দিতে ও তীর্থস্থানের উন্নয়নের জন্য অনুদান দিতে আগ্রহী, তারা দয়া করে নিম্নে উল্লেখিত নাম্বারগুলোর মাধ্যমে যোগাযোগ। **পর্বকর্তা সর্বনিম্ন ৫০০ টাকা, মিশার উদ্দেশ্য সর্বনিম্ন ১৫০ টাকা।**

মা মারীয়ার আশীর্বাদ লাভে আপনি/আপনারা সাদরে আমন্ত্রিত।

খ্রিস্টেতে,

ফাদার তরুণ বনোয়ারী (সমন্বয়কারী)
বারমারী ফাতেমা রাণী তীর্থ কার্যকারী কমিটি
মোবাইল : ০১৯১৬-৪২৪৪৩৮ বিকাশ (ব্যক্তিগত);
ফাদার নরবার্ট গমেজ : ০১৬১৮-৩৪৩৬২৭ বিকাশ (ব্যক্তিগত)

অনুষ্ঠানসূচী

অক্টোবর ২৬, ২০২৩	অক্টোবর ২৭, ২০২৩
পাপস্বীকার ঃ ৩:০০ মি.	জীবন্ত ক্রুশের পথ ঃ ৮:০০ মি.
পবিত্র খ্রিস্টযাগ ঃ ৫:০০ মি.	মহাখ্রিস্টযাগ ঃ ১০:০০মি.
জপমালার আলোর শোভাযাত্রা ঃ ৮:০০ মি.	
সাক্রামেন্তের আরাধনা ও নিরাময় অনুষ্ঠান ঃ ১১:০০ মি.	
নিশি জাগরণ ঃ ১২:৩০ মি.	

বিজ্ঞ/২৯৮/২০২৩

আনন্দ সংবাদ! আনন্দ সংবাদ!! আনন্দ সংবাদ!!!

শোকার্ত জননীর ধর্মপল্লী'র জয়ন্তী উৎসব ২০২৩

সম্মানিত সুধী,

শোকার্ত জননীর ধর্মপল্লী ভবরপাড়া, মুজিবনগরের পক্ষ থেকে খ্রিস্টীয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইল। অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত এলাকায় **খ্রিস্ট বিশ্বাসের বীজ বপনের ১৫৮ বছর এবং গীর্জা প্রতিষ্ঠার ১০০ বছর পূর্তি জয়ন্তী উৎসব আগামী ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে** উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে। এ মহতী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য ভবরপাড়াবাসী, তাদের আত্মীয়-স্বজন, শুভাকাঙ্ক্ষী ও সকলকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

-: অনুষ্ঠানের সময়সূচী :-

তারিখ	অনুষ্ঠান	সময়
২৬ ডিসেম্বর ২০২৩	চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা	সকাল ১০:০০ টায়
	উদ্বোধনী অনুষ্ঠান : প্রার্থনা অনুষ্ঠান/১০০ প্রদীপ প্রজ্জ্বল/স্মৃতিস্তম্ভ উদ্বোধন/আতশবাজী	বিকাল ৪:০০ টায়
২৭ ডিসেম্বর ২০২৩	মহা খ্রিস্টযাগ	সকাল ৯:০০ টায়
	আনন্দ র‍্যালি	সকাল ১১:০০ টায়
	মধ্যাহ্নভোজ	দুপুর ০১:০০ টায়
	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান - সম্মাননা প্রদান/অতিথিদের বক্তব্য/লটারী ড্র/ব্যান্ড সঙ্গীত	বিকাল ৪:০০ টায়

ফাদার যাকোব এস. বিশ্বাস
আহ্বায়ক
জুবিলী উদ্‌যাপন কেন্দ্রীয় কমিটি

ফাদার বাবুল বি. বৈরাগী
পাল-পুরোহিত ও যুগ্ম আহ্বায়ক
জুবিলী উদ্‌যাপন কেন্দ্রীয় কমিটি

প্রবীর মণ্ডল
সেক্রেটারী
জুবিলী উদ্‌যাপন কেন্দ্রীয় কমিটি

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : **01798-513042,** E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org